রক্তঝরা নভেম্বর ১৯৭৫

নির্মলেন্দু গুণ

রক্তঝরা নভেম্বর ১৯৭৫

নির্মলেন্দু গুণ

প্রচ্ছদ : আহসান হাবীব
সংস্করিত মুদ্রণ : মার্চ ২০১৪
প্রকাশক – রামশংকর দেবনাথ

পিডিএফটি (PDF) ‘মুক্তিযুদ্ধ ই-আর্কাইভ’-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত

উৎসর্গ

সৈয়দ নজরুল ইসলাম
তাজউদ্দিন আহমদ
এম মনসুর আলী
এ এইচ এম কামরুজ্জামান
মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফ
কর্ণেল খন্দকার নাজমুল হুদা
ও
লে. কর্ণেল এটি এম হায়দার

স্মরণে উৎসর্গিত

আবেদন

নুক্, কিন্ডেল, কোবো বা ট্যাব ছাড়া ই-বই পড়ার অদম্য আগ্রহ থেকেই এই ইপাব তৈরি যা খুব সহজেই হাতের স্মার্টফোনে যে কোন অবসরেই পড়ে ফেলা যায়। আলাদা করে ই-বুক রিডার কেনার কোন প্রয়োজন নেই বা পিডিএফের মত জুম করে ডান-বা দিকে সরিয়ে পড়ারও দরকার নেই।

কিন্তু অন্তর্জালে পছন্দের বাংলা বইয়ের পিডিএফ যাও বা পাওয়া যায়, ইপাব অপ্রতুল। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও প্রচারের জন্য তাই নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় (ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টুইটার, লিঙ্কডইন ইত্যাদিতে) এই ইপাব ছড়িয়ে দিতে হবে।

প্রচ্ছদ, প্রকাশনা, উৎসর্গ ও ভূমিকা (যদি কিছু থাকে, পিডিএফ-এ বেশীরভাগ সময় খাকে না।) ইত্যাদি প্রথমদিকের পাতাগুলো দেখতে না পেলে ঠিক বই বই ভাবতে অসুবিধা হয়, তাই তথাকথিত এই অপ্রাসঙ্গিক পাতাগুলিও রাখা হয়েছে।

অন্তর্জাল থেকে পছন্দের বইয়ের পিডিএফ নামিয়ে টেক্সটে রূপান্তরিত করা- এ কাজে ভি-ফ্ল্যাটের এখনো কোন জুড়ি নেই। এবার একে ওয়ার্ড বা অন্য কিছুতে এডিট করে ক্যালিবার এর সাহায্যে ইপাব। এটাই সহজ পদ্ধতি।।

ভি-ফ্ল্যাটের সাহায্যে পিডিএফ থেকে তৈরি, ভুল থাকলে জানান। বইটির বিষয়বস্তু ইন্টারনেটের বিভিন্ন ওয়েবসাইটে প্রকাশ্যেই উপলব্ধ। সমালোচনা, মন্তব্য, প্রতিবেদন, শিক্ষাদান, বৃত্তি এবং গবেষণার মতো অলাভজনক, শিক্ষামূলক বা ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য, বাণিজ্যিকভাবে বিতরণের জন্য কখনোই নয়।

ভূমিকা

বাংলাবাজার পত্রিকার সঙ্গে আমার যুক্ত হওয়ার ঘটনাটি, আমার গদ্যরচনার জন্য খুবই ফলপ্রসূ হয়েছে। 'আমার ছেলেবেলা' প্রকাশিত হওয়ার সাত বছর পর, আমার আত্মজীবনীর দ্বিতীয় খণ্ড 'আমার কণ্ঠস্বর' বাংলাবাজার পত্রিকার সাহিত্য বিভাগেই ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এবার, পত্রিকার সম্পাদকীয় পাতা ভরাট করার জন্য আমি যখন নবপর্যায়ে নির্গুণের জার্নাল লিখতে শুরু করি, তখন পর্যন্ত এই গ্রন্থটি আমার চিন্তা বা পরিকল্পনার ভিতরে ছিল না।

১৯৭৫-এর নভেম্বর নিয়ে উপসম্পাদকীয় লিখতে বসে, আমি হঠাৎই অনুভব করলাম, আমার ভিতর থেকে কী যেন উকি দিচ্ছে। এটি যে একটি পূর্ণ-গ্রন্থ, তা বুঝতে পারলাম সংশ্লিষ্ট সময় নিয়ে দ্বিতীয় কিস্তিটি রচনা করার সময়। বিষয়টি যখন আমার কাছে ধরা পড়লো, তখন মনে হলো, হ্যাঁ, আমার মনের ভিতরে এই গ্রন্থ রচনা করার সঙ্গোপন প্রস্তুতি তো ছিলই। ১৯৭৫-এর নভেম্বর মাসটিকে আমি তো আমার বুকের ভিতরে গত ২১ বছর ধরে গোপন ক্ষতের মতোই বয়ে বেড়িয়েছি। এটি অরচিত গ্রন্থ নয়। এই গ্রন্থটি আমার ভিতরে রচিত হয়েই ছিল। তাই, ডুবে যাওয়া জাহাজ সনাক্ত হওয়ার পর, তাকে তুলে আনার কাজ সম্পন্ন করতে আমার একটুও বেগ পেতে হয়নি। ঐ ডুবে যাওয়া জাহাজের মধ্যে দেশবাসীর বহু প্রিয়-লাশের সঙ্গে আমার নিজের লাশটিও আটকা পড়ে ছিল। তাই, মমতা সহকারেই সময়সমুদ্রের অতল গহ্বর থেকে, আমি ঐ জাহাজটিকে উত্তোলন করেছি, যার নাম হতে পারে, 'রক্তঝরা নভেম্বর ১৯৭৫'।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের সবচেয়ে বড়-ট্রাজেডিগুলোর সঙ্গে আমার কবিজীবন, অনতিক্রম্য ঘটনার আবর্তে কীভাবে ক্রমশ জড়িয়ে পড়েছিল, 'রক্তঝরা নভেম্বর ১৯৭৫'-এ আমি সে-কথাই ইতিহাসের আদলে বলবার চেষ্টা করেছি। এই আত্মজৈবনিক গ্রন্থটি আমার ব্যক্তিজীবনকে অতিক্রম করে, অনুসন্ধিৎসু ইতিহাস পাঠকের দাবিপূরণে যদি সক্ষম হয়, তাহলেই আমার শ্রম সার্থক বলে গণ্য করবো।

কবিতার পরিবর্তে, সময় যে আমাকে দিয়ে আমার দেশের ইতিহাস লিখিয়ে নিচ্ছে, এ এক রহস্যজনক ঘটনাই বটে।

- নি. গুণ

পলাশী ব্যারাক, ঢাকা
২০ ডিসেম্বর ১৯৯৬

***

১

আমার বড় ভাই ভারতের নাগরিক। পশ্চিমবাংলার শিল্পনগরী দুর্গাপুরে তিনি চাকরী করেন। ১৯৭১ সালে আমরা তাঁর কাছেই গিয়ে উঠেছিলাম। ডিসেম্বরে দেশ স্বাধীন হয়ে যাবার পর জয়-বাংলার শরণার্থীরা সবাই যখন দল বেঁধে ফিরতে শুরু করে, তখন আমরাও দেশে ফিরে আসার জন্য মানসিকভাবে তৈরি হই। আমার বড় ভাই আমাদের দেশে ফিরে যাবার ব্যাপারটিকে আরও কিছুদিনের জন্য স্থগিত রাখার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, এখনই দেশে ফিরে যাওয়াটা ঠিক হবে না। কিছুদিন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা দরকার। আগে তো শেখ মুজিবর মুক্তি পাক। [আমি ১৯৬৯-এর ২৩ ফেব্রুয়ারি রমনা রেসকোর্সের জনসভায় উপস্থিত ছিলাম—যেদিন ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পটভূমিতে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে সদ্য মুক্তি পাওয়া শেখ মুজিবকে পাঁচ লক্ষাধিক জনতার সামনে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে

ভূষিত করা হয়েছিল। তখন থেকেই আমি শেখ মুজিবকে বঙ্গবন্ধু বলতাম কিন্তু আমার বাবা এবং আমার বড় ভাই বঙ্গবন্ধুকে সাধারণত মুজিবরই বলতেন। কখনও কখনও বলতেন শেখ মুজিবর।] মুজিবর দেশে ফিরুক। দেশটি তো এখনও নেতাশূন্য। দেশের মানুষ তোদের ঐ তাজউদ্দিন আর নজরুল ইসলামকে বেশিদিন মানবে না। মুজিবরের না ফিরা পর্যন্ত বাংলাদেশের অবস্থা স্বাভাবিক হবে না। মারামারি হানাহানি লেগে থাকবে। বলা যায় না, অচিরেই আবার হয়তো জয় বাংলা ছেড়ে তোদের পালাতেও হতে পারে।

আমরা যদিও দেশে ফেরার জন্য খুবই ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলাম, দেশের জন্য আমাদের মন যদিও খুবই চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, তথাপি আমার বড় ভাইয়ের অনুমোদন না পাওয়ার কারণেই আমাদের দেশে ফেরা বিলম্বিত হতে থাকে। নিজ পরিবার থেকে দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্ন থাকার পর মুক্তিযুদ্ধের কারণে পারিবারিকভাবে মিলিত হতে পারার ব্যাপারটি আমার বড় ভাইয়ের মনে একটা নতুন আবেগের সৃষ্টি করেছিল। কোনো সন্দেহ নেই যে, দুর্গাপুরে আমাদের খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা করতে গিয়ে তাঁকে বেশ কষ্ট করতে হচ্ছিল। তাই দ্রুত আমাদের শরণার্থীদশার অবসান হোক, এটি তিনি হয়তো আমাদের চাইতেও বেশি করেই চাইতেন। কিন্তু যখন সত্যি-সত্যি চোখের পলকে আমাদের দেশটি স্বাধীন হয়ে গেলো এবং আমরা আমাদের সাতপুরুষের ভিটা-বাড়িতে ফিরে আসার জন্য অস্থির হয়ে উঠলাম তখন আমার বড় ভাইয়ের মনে হয়তো আমাদেরকে আরও কিছুদিনের জন্য নিজের কাছে ধরে রাখার গোপন ইচ্ছাও কাজ করে থাকবে। হয়তো সেজন্যই তিনি আমাদের সামনে ভবিষ্যতের বাংলাদেশের একটি ভয়াবহ চিত্র সবসময়ই তুলে ধরছিলেন। মুজিবর ফিরে আসার পরও সাম্প্রদায়িকতা থেকে দেশটি মুক্ত হতে পারবে, তা তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। আর মুজিবর যদি না ফিরেন, তবে তো কথাই নেই।

কিন্তু নতুন বছরে, জানুয়ারির ১০ তারিখে পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করে লন্ডন-দিল্লী হয়ে বঙ্গবন্ধু যখন বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার মাটিতে পা রাখেন, তখনই আমার বড় ভাইয়ের অনুমোদনক্রমে আমাদের পরিবার বাংলাদেশে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

পাকিস্তানের কারাগার থেকে বঙ্গবন্ধু যদি মুক্তি না পেতেন; যদি তিনি স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরতে না পারতেন, -আমরা কি তাহলে ভারতেই থেকে যেতাম? আমার কথা ঠিক বলতে পারি না, তবে মনে হয় আমার পরিবারটি হয়তো থেকেই যেতো। অন্তত আমার বড় ভাই সেরকমটিই চাইতেন। দেশে ফেরার ব্যাপারে আমার বাবাও কিছুটা দ্বিধার মধ্যে ছিলেন। কবিতা লেখার কারণে, কবিতা লিখে দেশের মানুষের ভালোমন্দের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়ার কারণে ব্যক্তিগতভাবে দেশের প্রতি আমার মনে যতটা দুর্বলতার সৃষ্টি হয়েছিল; আমার পরিবারের অন্য সদস্যদের মধ্যে তা ছিল না। বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকাতে এবং স্বাধীনতা লাভের অল্পদিনের ব্যবধানে পাকিস্তানী কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে বাংলাদেশে ফিরে আসাতে, অন্যদের কথা জানি না, আমাদের পরিবারটি খুবই লাভবান হয়। ১৯৭১ সালে হিন্দুদের মধ্যে যারা শরণার্থী হয়েছিলেন, তাদের বেশ কিছু ভারতে থেকে যান। দশই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে না এলে আমাদেরও হয়তো ভারতেই স্থান হতো। ঢাকার টানে কিছুদিনের জন্য দেশে ফিরে এলেও, পরিবারের আপনজনদের টানে আমাকেও হয়তো এক-পর্যায়ে ভারতেই চলে যেতে হতো। চলে যেতে যে হয়নি, তাকে আমি আমার সৌভাগ্য বলেই মানি।

বঙ্গবন্ধু দেশে ফেরার পর স্থির হয়, আমরা দুই পর্যায়ে ভারত ত্যাগ করবো। আমি দেশে ফিরে এসে দেশের অবস্থা জানিয়ে দুর্গাপুরে চিঠি লিখব, তারপর আমার পরিবার দেশে ফেরার ব্যাপারটি চূড়ান্ত করবে। তার আগে নয়। ঐরূপ পারিবারিক সিদ্ধান্তের জটিলতার কারণেই বহু প্রত্যাশিত মুক্তিযুদ্ধের বিজয় দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। আমি বিজয় দেখিনি।

আমি যুদ্ধজয়ের একমাস পর, পরবর্তী বছরের জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ে ঢাকা ফিরি। ঢাকা ফিরে এসে আমি উঠেছিলাম মগবাজারের মুক্তিযোদ্ধা হেলালের বাসায়।

হেলালের সঙ্গে নাট্যকার মামুনুর রশীদের মাধ্যমে আমার পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়েছিল ১৯৬৭ সালের দিকে। আমরা মগবাজারের ক্যাফে তাজ-এ অনেকদিন একসঙ্গে আড্ডা দিয়েছি। পরে একাত্তরে হেলাল মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয় এবং কলকাতায় আবার কিছুদিন আমাদের একসঙ্গে থাকার সুযোগ হয়। দীর্ঘদিন পরবাসে কাটিয়ে আমার প্রিয় নগরীতে ফিরে এসে আমার নিরাপত্তার কথা ভেবে যখন আমি মনে মনে একজন বিশ্বস্ত বন্ধুর সন্ধান করছিলাম, তখন আমার কেন জানি হেলালের কথাই মনে পড়লো। হেলালের বাসায় দু'দিন থাকার পর আমি সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে গিয়ে উঠি। সেখানে থাকার জন্য ছাত্রনেতা আসম আবদুর রব এবং হলের ভিপি জিনাত আলী আমাকে ঐ হলের একটি রুম ছেড়ে দিয়েছিলেন।

কয়েকদিন ঢাকায় কাটিয়ে আমি আমার গ্রামের বাড়িতে যাই। আমার গ্রামের এবং এলাকার মানুষ অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে আমাকে গ্রহণ করে। আমাদের ফেলে যাওয়া বাড়িঘরও মোটামুটি বাসযোগ্যরূপেই পাওয়া যায়। পাকসেনাদের আগমন সংবাদের প্রচারিত শংকার ভিতরে, স্থানীয় আত্মসম্মানবঞ্চিত লোভী-মুসলমানদের মধ্যে যারা আমাদের বাড়িঘর লুটপাট করেছিল, তারা এসে রাতের অন্ধকারে আমার সঙ্গে দেখা করে এবং কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। তারা খুবই কাতরকণ্ঠে জানায়, আমি যদি তাদের না রক্ষা করি তাহলে মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা তাদের মেরে ফেলবে। এখন তো বটেই, যৌবনেও আমি ছিলাম খুবই নরম মনের মানুষ। আমি তাদের ক্ষমা করে দিই। ফলে ওদের সঙ্গে অচিরেই আমার সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। আমি তখন 'বাংলাদেশ বাসযোগ্য' বলে দুর্গাপুরে রিপোর্ট পাঠাই। আমার কাছ থেকে ইতিবাচক রিপোর্ট পেয়ে আমার পরিবারের অন্য সদস্যরাও শরণার্থী জীবনের ইতি ঘটিয়ে, দেশে ফিরে এসে নতুন করে বসতি স্থাপন করে।

বঙ্গবন্ধুর অনুরোধে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে বাংলার মাটি থেকে অভাবিত দ্রুততার সঙ্গে প্রত্যাহার করতে রাজি হলে, আমার বাবা একটু ভড়কে যান। শুধু বঙ্গবন্ধু বা আওয়ামী লীগই তো বিবেচ্য নয়; মুসলিম লীগার, আলবদর-রাজাকার এবং অতিবিপ্লবী চৈনিক-পরিবৃত বাংলাদেশের মাটিতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর উপস্থিতির বিষয়টিও আমাদের দেশে ফিরে আসার সিদ্ধান্তটিকে প্রভাবিত করেছিল। অবিশ্বাস্য দ্রুততায় বাংলার মাটি থেকে ভারতীয় সৈন্য সরিয়ে নেবার সংবাদে আমার বাবা কিছুটা চিন্তিত হয়ে পড়েন। ভারতীয় সেনাদের সহায়তা ছাড়া আওয়ামী লীগ ও তার মিত্ররা দেশকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে বলে আমার বাবা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তিনি মনে করতেন, ভারতীয় সেনাবাহিনীকে আরও কিছুদিন বাংলাদেশে রাখা দরকার। আমি ঢাকা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ভারতীয় সৈন্যদের বিদায়ী অনুষ্ঠানটি দেখেছিলাম এবং ভিড় ঠেলে ইষ্টার্ন কমান্ডের জিওসি লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার সঙ্গে করমর্দন করেছিলাম। ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন সদস্যকে কৃতজ্ঞতা ও সম্মান জানানোর বাসনা আমার মাধ্যমে পূর্ণ হওয়ার সংবাদে আমার বাবা খুব খুশি হয়েছিলেন।

আমার এক পিসতুতো ভাই পি. সি. সোম ছিলেন ভারতীয় বিমান বাহিনীর পাইলট। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মিত্রবাহিনীর হয়ে গভর্নর হাউস এবং ঢাকা সেনানিবাসে পরিচালিত বিমান হামলায় তিনি অংশ নিয়েছিলেন। ভারতীয় সেনাবাহিনীতে আমার আরও একজন কাকা ছিলেন। আমার বাবার আপন মামাত ভাই। তাঁর নাম কর্নেল বি. সি. দত্ত। ১৯৭১ সালে শিলিগুড়ি ক্যান্টনমেন্টে তিনি কর্মরত ছিলেন। তিনিও মিত্রবাহিনীর হয়ে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নেন। আমি নিজে অস্ত্রহাতে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিইনি, আমার সেরকম সাহস ছিল না; কিন্তু আমার ঐ দু'জন নিকট-আত্মীয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন বলে আমি মনে মনে কিছুটা স্বস্তিবোধ করতাম। ভাবতাম, আমার বাবা ও তাঁর পরিবারের অনিচ্ছার মধ্যে যেমন পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটির জন্ম হয়েছিল,—বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটি আমাদের কাছে সেরকম নয়; এই দেশটি, আমার ও আমার পরিবারের সদস্যদের প্রবল ইচ্ছার মধ্যে; ত্যাগ, কষ্ট ও স্বপ্নের মধ্যে জন্ম নিয়েছে। খুব সরাসরি না হলেও, ভারতের মাধ্যমে আমার নিকটজনরাও এসে ঘটনাচক্রে যুক্ত হয়েছেন এই দেশ-জন্মের প্রক্রিয়ায়।

সুতরাং এই দেশটির ওপর আমার অধিকার প্রশ্নাতীতভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অতঃপর এই দেশে আমার থাকা না-থাকার ব্যাপারটি বাংলাদেশে ভারতীয় সেনাবাহিনীর উপস্থিতি বা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকা না-থাকার ওপর নির্ভর করে না। পৃথিবীর মানচিত্রে এই দেশটি যদি টিকে থাকে, তার শাসক যারাই হোক না কেন, আমি তাতে থাকবো। এ আমার অধিকার। শ্রী অন্নদাশংকরের ভাষায় বলা যায়—'যতদিন রবে পদ্মা মেঘনা গৌরী যমুনা বহমান…' ততদিন। বাংলাদেশের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতাকে অন্যতম রাষ্ট্রনীতি হিসেবে ঘোষণা করে এই ভূখণ্ডে বসবাসকারী (তা বাঙালি বা বাংলাদেশী যাই বলি না কেন) জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐ ন্যায়নিষ্ঠ বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুর নিহত হওয়ার পর, আমার মধ্যে যে তীব্র ভীতি, প্রচণ্ড ঘৃণাবোধ ও উৎকণ্ঠামিশ্রিত আবেগের সৃষ্টি হয়েছিল; —তার অন্তরালের মনস্তাত্ত্বিক পটভূমি উপরে কিছুটা বর্ণিত হলো। বঙ্গবন্ধুহীন বাংলাদেশে আমার মনে পড়ে যায় আমার বড় ভাইয়ের কথা। আমি ভাবতে বসি, তবে কি আবার আমাকে ভারতে চলে যেতে হবে? দেশটা কী আবার পাকিস্তানে পরিণত হবে? ১৫ আগস্টের হত্যাকান্ডের ভিতরে ফুটে ওঠা অভাবিত নির্মমতার দিকটির কথা ভেবে আমি খুবই বিচলিত ও অসহায় বোধ করি। আমার মনে প্রশ্ন জাগে, হত্যাকারীদের মনে ঘৃণার এই যে জোর—তারা কোথা থেকে তা পেলো? প্রতিহিংসাপরায়ণতার এই যে উচ্চমাত্রা—তা কী কেবলই মুহূর্তের মতিভ্রম? আমার বিশ্বাস হয় না। বিপুল সংখ্যক মুসলমানের বাসভূমি হলেও, এক শ্রেণীর মুসলমানের কাছে চিরশত্রুরূপে গণ্য হিন্দুস্থানের সহায়তার ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তানকে ভেঙে ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ গঠন করার অপরাধই ঐরূপ দুর্মর ঘৃণার জাতক ছিল বলে আমার মনে হয়।

মনে পড়ে, আমার ঐ সময়ের অসহায়ত্ববোধের সঙ্গে এক ধরণের অপরাধবোধও এসে যুক্ত হয়েছিল। ঐ অপরাধবোধটা ছিল, কবি আল মাহমুদের সম্পাদনায় প্রকাশিত গণকণ্ঠ পত্রিকায় কিছুদিন কাজ করার কারণে। আমি সরল বিশ্বাসে আমার প্রতিষ্ঠানবিরোধী চরিত্রের কারণে যে কাগজটিতে যোগ দিয়েছিলাম— পরবর্তীকালে ঐ কাগজটি জাসদের মুখপত্রে পরিণত হয়। বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সরকারকে জনবিচ্ছিন্ন করার ক্ষেত্রে ঐ পত্রিকাটি যে ভূমিকা রেখেছিল, আমিও সেখানে দাবার ঘুটি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিলাম। সেকথা ভেবে আমার অনুশোচনা হয়। আমি নিজেকে অপরাধী বলে ভাবতে থাকি। বিশ্বাসঘাতক এই নগরীটিকে আমার আর বাসযোগ্য বলে মনে হয় না। আমি স্থির করি, এই নগরীতে আর নয়। আমি অনির্দিষ্টকালের জন্য গ্রামের বাড়িতে ফিরে যাই।

কিছুদিনের মধ্যেই কাদের সিদ্দিকী ভারতে পালিয়ে গিয়ে কাদের বাহিনী গঠন করে। গ্রামে যাবার কিছুদিনের মধ্যেই কাদের বাহিনী গঠনের সংবাদ আমার কানে আসে। আমাদের এলাকার বিশেষ করে হিন্দু ছেলেরা বিপুল সংখ্যায় ঐ কাদের বাহিনীতে যোগ দিতে থাকে। রক্ষীবাহিনীর একজন লীডার কলমাকান্দার সুকুমার সরকারও কাদের বাহিনীতে যোগ দেয়। মেঘালয় সীমান্ত দিয়ে দুর্গাপুর, কলমাকান্দা, বারহাট্টা এবং মোহনগঞ্জে এসে কাদের বাহিনীর সদস্যরা থানা ও হাট-বাজারে হামলা চালাতে শুরু করে। কিন্তু ঐসব হামলার জোর এবং ভবিষ্যৎ ছিল খুবই অনিশ্চিত। কেননা ঐরূপ কাজে সিদ্ধি লাভ করার জন্য যেরকম বিপুল সংখ্যায় দেশত্যাগের দরকার ছিল এবং সাহায্যকারী দেশটির যেরূপ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত থাকা প্রয়োজন ছিল-ভারতের তৎকালীন সরকারের তা ছিল না। ফলে, ঐসব সম্ভাবনাহীন আক্রমণ দারোগা-পুলিশ অপহরণ এবং থানার অস্ত্র লুট করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। মাঝখান থেকে যাদের বাড়ি ঘর আশ্রয় নিয়ে ঐসব হামলা চালানো হচ্ছিল, কাদের বাহিনীর সদস্যদের চলে যাবার পর তারা খুবই বিপদের মধ্যে পড়ে যায়। আমার একজন মামা, আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতা ডাক্তার মতিলাল চৌধুরী (মোহনগঞ্জ থানার খলাপাড়া গ্রামে) কাদের বাহিনীর সদস্যদের আশ্রয় দানের অপরাধে পুলিশের হাতে

ধরা পড়েন এবং তাঁর পরিবারটি পুলিশি নির্যাতনের শিকারে পরিণত হয়। পরে মামলায় আমার মামা মতিলাল চৌধুরী এবং উনার এক ভাতিজা তুষারকে প্রায় বছর দশেক জেল খাটতে হয়েছিল।

মানসিক ভারসাম্য হারানো অবস্থায় আমি ঢাকা ত্যাগ করে গ্রামে ফিরে গিয়েছিলাম, গ্রামের নির্জনতা ও রাজনীতি থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে শান্তি ও স্বস্তি ফিরে পাবার আশায়। কাদের বাহিনীর থানা আক্রমণ ও আক্রমণের সঙ্গে আমার মামার জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশের হাতে গ্রেফতার হওয়ার সংবাদ শুনে আমি কিছুটা উন্মাদের মতোই আমার পরিবারের সঙ্গে গ্রামের বাড়িতে দিনাতিপাত করতে থাকি। ইতোমধ্যে ঢাকা থেকে আমার তরুণ কবি-বন্ধু গোলাম সাবদার সিদ্দিকী হঠাৎ একদিন আমার গ্রামে হাজির হয়। ওর আগমনে আমার মানসিক শান্তি বিঘ্নিত হয়। ওর অতিবিপ্লবী নকশালমার্কা কথাবার্তা আমার খুবই অপছন্দ ছিলো। ফলে তাকে আমি বেশিদিন আমার বাড়িতে থাকতে দিই না।

আমি গ্রামে ফিরে গিয়েই শুনতে পেয়েছিলাম, আমাদের গ্রামের মুসলেমউদ্দিন নামে একজন সরকারি কর্মচারী, মেজর ডালিমের কণ্ঠে বঙ্গবন্ধু হত্যার সংবাদটি রেডিওতে প্রচারিত হতে শুনে আনন্দে এমনই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারেন নি। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের বড় সড়ক ধরে তিনি খালি গায়ে, মাথায় গামছা বেঁধে দৌড়াতে শুরু করেন এবং চিৎকার করে বলতে থাকেন— 'ভাইসব, আর চিন্তা নাই, 'হিন্দুর বাপ' শেখ মুজিবুর শেষ। আপনেরা সব বাইরইয়া আসেন।' ঐ চিত্রকল্পটি কল্পনায় অনুভব করে আমার হাসিও পায় আবার রাগে দুঃখে, অক্ষম-যাতনায় মনে কষ্টও পাই। (এখানে মুসলেমউদ্দিন নামটি খুবই লক্ষণীয়। এমন মিল কী করে যে হলো!)

মুসলেমউদ্দিনের 'হিন্দুর বাপ' কথাটা আমার খুবই মনে লাগে। আমি ভাবি, শেখ মুজিব কি ছিলেন শুধুই হিন্দুদের বাবা? মুসলমানদের কেউ নন তিনি? অথচ হিন্দুদের জন্য সত্যিকার অর্থে তেমন কিছুই তো তিনি করে যাননি। তিনি না একাত্তরে, পাক বাহিনীর ভেঙে ফেলা রমনা কালীমন্দিরটি পুনঃনির্মাণ করেছেন, না তিনি ১৯৬৫-র পাক-ভারত যুদ্ধের পটভূমিতে ঘোষিত শত্রুসম্পত্তি আইনটি রদ করেছেন। না তিনি বৈষম্যমূলক সরকারি নীতির কারণে, চাকরি-বাকরির ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া হিন্দুদের বিশেষ কোনো সুবিধা দিয়ে মুসলমানদের পাশাপাশি এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন। তাহলে? শেখ মুজিব 'হিন্দুদের বাপ' হবেন কেন? কথাটা তো মোটেও সত্য নয়। তবুও তো বলা হলো। কেন বলা হলো? আমি ভাবতে বসি।

যদিও এইরকমের একটি অসৎ-প্রশ্নের কোনো সদুত্তর হয় না, তবু অনুমান করতে পারি সম্ভাব্য কারণ। তিনি কারও কারও কাছে হিন্দুদের বাপ বলে প্রতিভাত হয়েছেন:

১. হিন্দুস্তানের সহায়তায় পাকিস্তান ভাঙার জন্য।
২. বাঙালি জাতীয়তাবাদের জন্য।
৩. রবীন্দ্রনাথের প্রতি প্রীতির কারণে।
৪. ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ গ্রহণের জন্য।

মুসলেমউদ্দিনের মাথায় গামছা-বাঁধা দৌড়ের ঘটনাটি শোনার পর আমার কৃতজ্ঞ কবিচিত্ত এই সিদ্ধান্তে উপণীত হয় যে, শেখ মুজিবকে নিয়ে আমি কবিতা লিখবো। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হলেও তাঁর কথা আমি প্রচার করবো। সংখ্যালঘুর সমানাধিকারকে নিশ্চিত করার জন্য যিনি জীবন দান করে গেছেন, একজন সংখ্যালঘুর সন্তান হিসেবেই এ আমার পবিত্র কর্তব্য। তাঁর হত্যাকাণ্ডের অব্যবহিত পরে কয়েকটি প্রতীকী কবিতা আমি রচনা করেছিলাম। সিদ্ধান্ত নিলাম আর প্রতীকী কবিতা নয়, এবার সরাসরি লিখবো।

২

অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে, হঠাৎ একদিন ঢাকা থেকে একই খামে পাঠানো আমার দুই কবিবন্ধু আবুল হাসান ও মহাদেব সাহার দু'টি চমৎকার চিঠি পাই। তাদের সমবেদনাসিক্ত চিঠি দুটো পড়ে, বিশেষ করে আবুল হাসানের চিঠিটি পড়ে আমি ঢাকার প্রতি আমার অভিমান অনেকটাই ভুলে যেতে সক্ষম হই। আবার ঢাকা আমাকে ডাকে, আয় ফিরে আয়। তখনও আমি শারীরিকভাবে পুরোপুরি সুস্থ ছিলাম না। তাই আমার বাবা-মা আমাকে ঢাকায় যেতে বারণ করেন। আমার মা-বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আমি নভেম্বরের শুরুতে ঢাকায় ফিরে আসি।

একাত্তরের নয় মাস বাদ দিলে, এর আগে এতো দীর্ঘদিন আমি আমার প্রিয় নগরী ছেড়ে বাইরে কখনও থাকিনি। প্রায় আড়াই মাস পর, বঙ্গবন্ধুহীন এই নগরীতে ফিরে এসে আমি আর আমার নিউপল্টনের বাঁশের বেড়ার মেসটিতে ফিরে যাইনি। আমি আমার বন্ধু মহাদেব সাহার ১১২ আজিমপুরের বাসায় উঠি। দীর্ঘদিন পর আমাদের দেখা হয়। আমরা দু'জন মিলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলি। আমরা হিসেব মিলাতে চাই। কেন এই হত্যাকান্ড? কেন এই নৃশংশতা? এখন কোথায় যাবে বাংলাদেশ? সংখ্যালঘুরা বঙ্গবন্ধুহীন এই নতুন বাংলাদেশে থাকতে পারবে কি? ধর্মনিরপেক্ষতার পথ কি অনুসৃত হবে আর? নাকি একটি মিনি পাকিস্তান ('মুসলিম বাংলা' কথাটা তখন চালু হয়েছিল) পরিণত হবে এই দেশ? ভারত কী করবে? সোভিয়েত ইউনিয়ন কি পারবে আমেরিকার ষড়যন্ত্রকে রুখতে? দীর্ঘদিন পর আমরা প্রাণ খুলে কথা বলার সুযোগ পেয়েছি। আমাদের কথা ফুরাতে চায় না। রাজ্যের রাজনীতি এসে ভিড় করে আমাদের মাথায়। আলাপে-উদ্বেগে রাত ভোর হয়ে আসে। বাইরে খুব কমই বেরোই আমরা। মহাদেবের বাসায় অনেকটাই গৃহবন্দির মতো আমি থাকি। আমি যে ঢাকায় ফিরে এসেছি, তা খুব একটা মানুষকে জানাতে চাই না। পরদিন আবুল হাসানের সন্ধানে ওর শান্তিনগরের বাসায় যাবো, ঐরূপ স্থির করে অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করে আমরা ঘুমিয়েছিলাম।

ভোরের দিকে কয়েকটি রাশান মিগ-২১ বিমান ঢাকার আকাশ কাঁপিয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণের দিকে উড়ে যায়। সঙ্গে হেলিকপ্টার। শব্দে আমাদের ঘুম ভেঙে যায়। আমরা চমকে উঠি। অনেকদিন পর ঢাকার আকাশে, এ কিসের গর্জন? কার গর্জন? বঙ্গবন্ধুর নয়তো।

মারাত্মক একটা কিছু ঘটেছে—এমন আশঙ্কায় দ্রুত রেডিও নিয়ে আমরা সংবাদ শুনতে বসি। কিন্তু না, রেডিও চলছে না। একেবারে বন্ধ কোনো সাড়া শব্দই নেই। তবে? ভালো করে সকাল হবার আগেই পাড়ার মধ্যে একটা সাড়া পড়ে যায়। সবারই প্রশ্ন, রেডিও বাংলাদেশ বন্ধ কেন?

আকাশবাণী বা বিবিসিও আমাদের কোনো খবর দিতে পারে না। আমরা খবর জানতে দুপুরের দিকে প্রেসক্লাবে যাই। ওখানে গিয়ে খবর পাই, ভোরের দিকে সামরিক বাহিনীতে একটি অভ্যুত্থান হয়েছে। ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ এই অভ্যুত্থানটি করেছেন। সকালের দিকে ঢাকার আকাশে যে বিমান ও হেলিকপ্টারগুলো উড়েছিল সেগুলো উড়েছিল ঐ অভ্যুত্থানেরই পক্ষে। বিমান ও হেলিকপ্টারগুলোকে নাকি সোহরাওয়ার্দী উদ্যান এবং বঙ্গভবনের ওপর দিয়ে উড়ে যেতে দেখা গেছে। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে তখন ১৫ আগস্টের মোশতাকবর্ণিত সূর্য- সন্তানদের ট্যাংক ও আর্টিলারি বাহিনীর ঘাঁটি ছিল। ফলে, অভ্যুত্থানটি যে ঐসব তথাকথিত সূর্যসন্তানদের বিরুদ্ধেই ঘটেছে—তা বেশ সহজেই বোঝা গেলো। অভ্যুত্থানের খবর শুনে আমি ও মহাদেব খুব খুশি হই।

দেশে এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেলো—অথচ কোথাও কোনো প্রতিবাদ নেই—, এই অসহনীয় অবস্থানটি অবসান ঘটাতে আমাদের আনন্দের শেষ নেই। আমরা সতর্কতার সঙ্গে আমাদের মনের খুশি- ভাবটাকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করি। আমরা হচ্ছি ঘরপোড়া গরু। আকাশে সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পাই। বলা তো যায় না, যদি অভ্যুত্থানটি ব্যর্থ হয়ে যায়।

আমি আর মহাদেব দ্রুত বাসায় ফিরে আসি এবং আকাশবাণী, বিবিসি ও ভয়েস অব আমেরিকার সংবাদ শোনার জন্য রেডিও নিয়ে বসি। ঢাকা বেতার তখনও বন্ধ, তবে টিভি চালু ছিল। টিভিতে এমনকিছু সংবাদ পাওয়া যাচ্ছিল না, যা থেকে সামরিক বাহিনীর মধ্যে যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে, সে-সম্পর্কে কোনো সঠিক ধারণা লাভ করা যায়।

বিবিসি-র রাতের খবরে আমরা জানতে পারি যে, ৩ নভেম্বরের ভোরের দিকে, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি চার জাতীয় নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, এম. মনসুর আলী এবং এ এইচ এম কামরুজ্জামান নিহত হয়েছেন। সব প্রকারের কারাবিধান লংঘন করে সামরিক বাহিনীর কিছু লোক জেলের ভিতরে প্রবেশ করে চার বন্দি জাতীয় নেতাকে গুলি করে, বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করেছে। শুনে বেদনা ও ঘৃণায় আমরা স্তব্ধ হয়ে যাই। আমাদের চোখ থেকে ঘুম উধাও হয়ে যায়। আমরা খুব ভয় পেয়ে যাই। এও কি সম্ভব? এরকম একটি বর্বর হত্যাকাণ্ডের কথা তো আমরা ভাবতেও পারি না। পরে ১৫ আগস্টের নৃশংসতার দিকটির কথা স্মরণ করে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসি, অতঃপর ঐরকমের কাজ এদেশের মাটিতে খুবই সম্ভব। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা আমাদের জীবনের চারপাশে আততায়ীদের পদশব্দ অনুভব করতে থাকি।

পরদিন আমরা দু'জন ভয়ে ভয়ে বাসা থেকে বেরোই। আমরা যাবো নিউমার্কেট হয়ে প্রেসক্লাবে। মহাদেবকে তাঁর ছেলের জন্য দুধ সংগ্রহ করতে হবে। তখন গুঁড়ো দুধের খুবই আকাল চলছিল। নীলক্ষেতের কাছে যেতেই দেখি একটি মিছিল আসছে। মিছিল? আমরা চমকে উঠি 1 ১৫ই আগস্টের পর এটিই ঢাকার প্রথম মিছিল। নীরব মিছিলটি যাচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে। মিছিলে লোকজন খুব বেশি একটা নেই। শ'দুয়েক হবে। ঐ মিছিলে আমাদের পরিচিত অনেকেই। আমাদের পরিচিত বন্ধুদের মিছিলে দেখে আমরাও ঐ মিছিলে ভিড়ে যাই। শুনতে পাই এই মিছিলের অগ্রভাগে আছেন ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের বৃদ্ধা মাতা এবং ভাই আওয়ামী লীগ নেতা রাশেদ মোশাররফ। শুনে খুব ভালো লাগে।

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি চার জাতীয় নেতার হত্যা না ১৫ আগস্টের মোশতাকবর্ণিত সূর্যসন্তানদের বিরুদ্ধে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের অভ্যুত্থান কোনটি আগে ঘটছে, তা কেউই সঠিক করে বলতে পারলো না। জানলাম, এটি একটি মস্ত বড় ঘটনা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এই মিছিলের আয়োজন করেছে। বাংলাদেশ ছাত্রলীগ এবং বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সমন্বয়ে গঠিত ছাত্রসমাজ বঙ্গবন্ধু স্মৃতি দিবস পালনের জন্য ঐ মিছিলের আয়োজন করেছিল। ঐ মিছিলে ছিলেন সংসদ সদস্য মহিউদ্দিন আহমদ, সংসদ সদস্য শামসুদ্দিন মোল্লা, সংসদ সদস্য রাশেদ মোশাররফ, মরহুম খন্দকার মুহম্মদ ইলিয়াস, জনাব মোস্তফা মহসীন মন্টু, বেগম মতিয়া চৌধুরী, জনাব সাইফুদ্দিন আহমদ মানিক, জনাব মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, জনাব ইসমত কাদির গামা, খালেদ মোশাররফের বৃদ্ধা মাতা প্রমুখ।

সংগ্রাম ছাত্র সমাজের উদ্যোগে ঐদিন বিকেল ৪ টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশ শেষে নগরীতে একটি সংক্ষিপ্ত মিছিলও বের হয়।

৩ নভেম্বর খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে সামরিক অভ্যুত্থানটি না ঘটলে, মিছিল সহকারে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে শ্রদ্ধা জানাতে যাওয়া কি সম্ভব হতো? মনে হয় না। দীর্ঘ বিরতির পর বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর সুযোগ লাভ করার জন্য আমরা খুবই খুশি হই এবং খালেদ মোশাররফের প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করি। আরও একটি কারণে আমি খালেদ মোশাররফের প্রতি প্রতি দুর্বলতা বোধ করি, তা হলো, তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয়। ১৯৭৪ সালে কোনো একদিন সকালে নিউমার্কেটের নওরোজ কিতাবিস্তানে তাঁর সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন সচিত্র সন্ধানী পত্রিকার সম্পাদক জনাব গাজী সাহাবুদ্দিন সাহেব। ঐদিন খালেদ মোশাররফ বইয়ের দোকানে কিছু বই খুঁজছিলেন। খুব বেশি কথা হয়নি সামান্য পরিচয়ের ঘটনাটিই আমার মনে দাগ কেটেছিল। আমার ভালোই লেগেছিল তাঁকে। আমি জানতে চাইছিলাম তিনি কী ধরনের বই খুঁজছেন। কবিতা, গল্প, কি না? আমার কৌতূহলী

প্রশ্নের উত্তরে মুচকি হেসে খালেদ বলেছিলেন, না ভাই, আমি মিলিটারি স্ট্র্যাটেজির ওপর বই খুঁজছি। তবে আমি কবিতাও পড়ি।

১৯৭১ সালে কলকাতায় ইন্ডিয়া টু ডে পত্রিকার সম্পাদক প্রীতিশ নন্দীর মুখে তাঁর প্রশংসা শুনেছিলাম। প্রীতিশ খালেদের একটি বড় ইন্টারভিউ করেছিলেন। আমি সেকথা স্মরণ করলাম। খালেদ খুশি হয়ে হাসলেন। বললেন, প্রীতিশ? হ্যাঁ, খুব মনে আছে।

মিছিলের পেছনে হাঁটতে-হাঁটতে আমার ঐ দিনের কথা মনে পড়লো। সেদিন তিনি আমাদের লোক কি-না, তা ভাববার প্রয়োজন বোধ করিনি। আজ ঐটি জানাই সবচেয়ে বড় জানার বিষয় হয়ে দেখা দিলো। মনে হলো, খালেদ আমাদেরই লোক হবেন। যার মা আমাদের, যার ভাই আমাদের, তিনি আমাদের না হয়ে যান না। আমি মনে-মনে খালেদ মোশাররফের সাফল্য কামনা করতে থাকি।

সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল জিয়ার খবর কি–তা তখনও জানতে পারি না। তিনি কোথায় আছেন, তিনি কী ভাবছেন—তা কেউ-ই বলতে পারে না। খালেদ কি তাঁর বিরুদ্ধে এই অভ্যুত্থান করেছেন? নাকি বঙ্গবন্ধুর খুনীদের বিরুদ্ধে? জিয়া কি বঙ্গবন্ধুর খুনিদের পক্ষে আছেন? না বুঝতে পারার প্রচন্ড উত্তেজনা বুকে নিয়ে আমি অপেক্ষা করতে থাকি রাতে বিবিসির সংবাদভাষ্য শোনার জন্য। তখনও আমি ভাবতে ভালোবাসি, যার কণ্ঠে ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চের দুপুরে আমি বঙ্গবন্ধুর নামে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা ইথারে তরঙ্গিত হতে শুনেছিলাম—, মুক্তিযুদ্ধের সেই বীর, সেই মুজিবভক্ত জেনারেল জিয়াউর রহমানও এই অভ্যুত্থানে নিশ্চয়ই খালেদের পক্ষেই আছেন। হয়তো খালেদকে সামনে দিয়ে তিনি পেছনে অবস্থান গ্রহণ করেছেন কোনো কৌশলগত কারণে। ২৫ মার্চের গভীর রাতে পাক-সেনাদের হাতে বঙ্গবন্ধুর গ্রেফতার হওয়ার পর চট্টগ্রামস্থ স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক প্রচারিত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করে ১৯৭১-এর ২৭ মার্চে তিনি যে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছিলেন, আজ তাঁর সামনে আবার সেরকম একটি মুহূর্ত এসে উপস্থিত হয়েছে। তিনি কি এই দায়িত্ব এড়াতে পারেন?

আমেরিকার নির্বাচন শেষ হয়েছে। আজ সকাল সকাল (৬ নভেম্বর) বাংলাবাজার পত্রিকা অফিসে আসার আগে পুনঃনির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট আল গোর-এর বিজয় ভাষণ সিএনএন-এর চ্যানেলে শুনে এসেছি।

২ নভেম্বর তারিখে বাংলাবাজারের উপসম্পাদকীয় পাতায় ১৯৭৫ সালের রক্তঝরা নভেম্বরের স্মৃতিচারণমূলক যে লেখাটি শুরু করেছিলাম, আজ তার পরবর্তি কিস্তি লেখার কথা। প্রশ্ন উঠতে পারে, আজকের লেখার সঙ্গে আমেরিকার নির্বাচনের কোনো প্রাসঙ্গিক সম্পর্ক আছে কি? হ্যাঁ, আছে। খুবই সম্পর্ক আছে। ১৯৭৫ সালে আমেরিকার রাষ্ট্রক্ষমতা ছিল রিপাবলিকান দলের হাতে। আমেরিকার রিপাবলিকানরা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল। আমাদের পক্ষে ছিল ভারত-রাশিয়াসহ পূর্ব-ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক শিবির। আমেরিকান সশস্ত্র বিরোধিতার পরও আমরা যখন আমাদের বহু প্রত্যাশিত স্বাধীনতা লাভ করি, তখন আমেরিকা তা ভালোভাবে নিতে পারেনি। তাদের মধ্যে এক ধরনের পরাভববোধ কাজ করছিল। তদুপরি বঙ্গবন্ধু যখন দেশ চালাতে গিয়ে রাশিয়া কিউবা (আমেরিকার নিষেধ সত্ত্বেও কিউবায় চটের থলে রফতানি করা) ঘেঁষা নীতি গ্রহণ করেন, তখন বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সরকারকে উৎখাত করে বাংলাদেশকে একটি মিনি- পাকিস্তানে পরিণত করার ব্যাপারে আমেরিকার কম করেও নীরব সমর্থন তো ছিলই। এমন কথাই তখন আমরা শুনেছিলাম।

২১ বছর পর, বঙ্গবন্ধুর দল আওয়ামী লীগ যে আজ আবার বাংলাদেশের ক্ষমতায় ফিরে এসেছে, আসতে পেরেছে, তার পেছনে শুধু দেশের ভিতরের জনসমর্থনই নয়, বর্তমানে বিরাজিত আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটটিও বিবেচ্য। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন- এর ভেঙে যাওয়া এবং আমেরিকার রাষ্ট্রক্ষমতায় রিপাবলিকানদের স্থলে ডেমোক্রাটদের আসীন হওয়ার ব্যাপারটিও আওয়ামী লীগের রাষ্ট্রক্ষমতায় ফিরে আসতে

পারার পথ প্রশস্ত করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন পরাশক্তিধর দেশ হিসেবে সত্তরের দশকে আমাদের দেশটিকে স্বাধীন হতে সাহায্য করেছিল। নব্বইয়ের দশকে এসে সেই সোভিয়েত ইউনিয়ন নিজেকে ভেঙে, দুর্বল করে আমাদের রাষ্ট্রক্ষমতা ফিরে পেতে ভিন্নভাবে সাহায্য করলো। সোভিয়েত ইউনিয়ন যদি টিকে থাকতো, তাহলে আমেরিকায় রিপাবলিকানরাও টিকে থাকতো, আর তখন আওয়ামী লীগের পক্ষেও ক্ষমতায় যাওয়া হয়তো সম্ভবই হতো না। আমেরিকার উস্কানিতে দেশে আরও একটি সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে যেতো।

'৯৪-৯৫ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে গড়ে ওঠা জনপ্রিয় অসহযোগ আন্দোলনের সময় বেগম খালেদা জিয়ার অনুরোধ সত্ত্বেও জেনারেল নাসিম যে ক্ষমতা দখল করেননি—তার পেছনেও রয়েছে ঐ পরিবর্তিত বিশ্বরাজনৈতিক প্রেক্ষাপট। আজ ক্ষমতায় গিয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা যে ১৫ আগস্ট ও ৩ নভেম্বরের জেলহত্যার বিচার কার্য প্রক্রিয়াটি নির্ভয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারছেন—তার পেছনেও আছে আমেরিকা। আছেন ক্লিনটন। মানে ঐ ডেমোক্র্যাটিক পার্টি। বাংলাদেশ সরকার সতর্কতা অবলম্বন করার প্রয়োজনে কোনো স্পর্শকাতর বিদেশি রাষ্ট্রকে ১৫ আগস্ট বা ৩ নভেম্বরের ঘটনার সঙ্গে জড়িত না করার জন্য গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে পরামর্শ দিয়েছেন। সতর্কতা অবলম্বন করা নিশ্চয়ই ভালো। তবে, সত্য উদঘাটনের স্বার্থে ১৯৭৫-এর ঘটনার পেছনে আমেরিকার উস্কানি ছিল, —এমন তথ্য যদি উদঘাটিত হয়েও পড়ে, তাতেও খুব একটা অসুবিধা হবে বলে আমার মনে হয় না দ্বিতীয়বারের মতো নির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন তো আমেরিকার ভিয়েতনাম-নীতির সমালোচনা করেই নবীন আমেরিকার জনচিত্ত জয় করেছিলেন। বিল ক্লিনটন মার্কিন জনগণকে বুঝাতে পেরেছেন যে, রিপাবলিকানদের দায় বহন করাটা ডেমোক্র্যাটদের জন্য বাধ্যতামূলক কিছু নয়। তাতেই বরং আমেরিকার লাভ। তাতে এক দলের ভুল করার সুযোগ যেমন থাকে, অন্য দলের পক্ষে সেই ভুল সংশোধন করার উপায়ও থাকে। প্রয়োজনে খারাপও হওয়া যায়, আবার প্রয়োজনে ভালোও হওয়া যায়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাগ্য ভালো বলেই মনে হচ্ছে। তিনি গত মাসে যখন আমেরিকায় ছিলেন, তখন আমাদের সাগরে গভীর নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়েছিল। ১৯৯১ সালে বেগম খালেদা জিয়ার ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই গৃহশত্রুরূপী সমুদ্র আমাদের উপকূলে আঘাত হানে। তাতে হাজার হাজার প্রাণ ও প্রচুর ধনসম্পদ বিনষ্ট হয় এবং ত্রাণ কার্যের ছুঁতো ধরে রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ-এর নির্দেশে অপারেশন ডেজার্ট স্টর্ম সাঙ্গ করে দেশে ফেরার পথে মার্কিন সেনারা খালেদা জিয়ার অনুমতি না নিয়েই বাংলাদেশের জলসীমায় প্রবেশ করে নতুন সরকারকে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে ফেলেছিল। আমি ঐ সময় আমেরিকা ভ্রমণে ছিলাম এবং বাংলাদেশে মার্কিন সৈন্য প্রবেশের বিরোধিতা করে সেখানকার বাংলা কাগজে বিবৃতি দিয়েছিলাম।

এবারের নিম্নচাপের সংবাদ শুনেও আমার মনে আশঙ্কা হয়েছিল, কী জানি আবার। কিন্তু না এবার আর ঐ রূপ কিছু ঘটেনি। ঘটেনি যে, খুব অল্পের ওপর দিয়েই যে ঐ নিম্নচাপটি আমাদের দেশ অতিক্রম করেছে—তা শেখ হাসিনার জন্য খুবই সৌভাগ্যসূচক বলে গণ্য হয়েছে। আর চলতি নভেম্বরের শুরুতেই মার্কিন নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রার্থী বিল ক্লিনটনের পুনরায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার ব্যাপারটিও শেখ হাসিনার জন্য খুবই ভালো হলো। অতঃপর ১৫ আগস্ট ও ৩ নভেম্বরের বর্বর হত্যাকাণ্ডের বিচার করার পথে শেখ হাসিনা অন্তত আমেরিকার দিক থেকে কোনোরূপ বাধার সম্মুখীন হবেন না বলেই মনে হয়।

আশা করি এতক্ষণ পর, আমার চলতি রচনার সঙ্গে এবারের মার্কিন নির্বাচনের প্রাসঙ্গিকতা প্রতিষ্ঠায় আমি মোটামুটিভাবে কৃতকার্য হয়েছি। এবার আমি ১৯৭৫-এর রক্তঝরা নভেম্বরের স্মৃতিচারণে ফিরে যেতে পারি। ১৫ আগস্টের ঘটনার পর আমি অনির্দিষ্ট কালের জন্য আমার গ্রামের বাড়িতে ফিরে গিয়েছিলাম। সহসা ঢাকা ফিরে আসার কোনো ভাবনাই আমার ছিল না। আমি আমার দেশ সম্পর্কে সকল আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিলাম। নিকটবর্তি

থানা শহরে গিয়ে খবরের কাগজ পড়তে পারতাম-, কিন্তু পড়তাম না। বাড়িতে রেডিও ছিল না, পাশের বাড়িতে ছিল-, ইচ্ছে করলে শুনতে পারতাম, কিন্তু শুনতাম না। ঢাকায় কী হচ্ছে না হচ্ছে, আমি প্রায় কিছুই খবর রাখতাম না। আমি সারাদিন আমাদের গ্রামের শ্মশানে জগা সাধুর আশ্রমে পড়ে থাকতাম। আধ্যাত্মিক গান শুনতাম এবং দিনরাত সিদ্ধি সেবন করতাম। সংসার ত্যাগী জগা সাধুর সঙ্গে আমার একটা আত্মিক-আধ্যাত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। জগা সাধুর আশ্রমটা ছিল আমার মায়ের শ্মশানের খুবই কাছে। ঐ আশ্রমে বসে আমি আমার ছোটবেলায় হারানো মাকে অনুভব করতাম। আসলে, পরে বুঝেছি, ঐ সময়টায় এক ধরনের মানসিক রোগীতে পরিণত হয়েছিলাম আমি। আমার ঐ মানসিক রোগটার কী নাম জানি না- রোগটা ছিল সবাইকে সন্দেহ করা। সবসময় আমার মনে হতো, আমাকে মেরে ফেলার জন্য বিশ্বজুড়ে একটা গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। ঐ ষড়যন্ত্রের হোতা হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ। আমার তখন মনে হতো, আমি তো শুধু আমি নই, বঙ্গবন্ধুর আত্মা বা রুহু পুনর্জন্মের আশায় আমার ভিতরে এসে আশ্রয় নিয়েছে। এই সংবাদটি সিআইএ-এর অজানা নয়। তাই, আমাকে শেষ করে দেবার জন্য সিআইএ-এর লোক এই প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্তও হানা দিতে পারে। আমার বিমাতা তো পারেনই, আমার আপন পিতাও প্রচুর ডলারের লোভে সিআইএ-এর ফাঁদে পা দিতে পারেন। কিছুই বলা যায় না। কাউকেই বিশ্বাস নেই। আমার খুবই সতর্ক থাকা দরকার। মানুষকে বিশ্বাস করা চলবে না। বঙ্গবন্ধু মানুষকে বিশ্বাস করে ঠকেছেন। আমাকে যে খাদ্য প্রদান করা হতো, আমি ঐ খাদ্য অন্যকে খাইয়ে টেস্ট করে তবেই খেতাম। তার আগে নয়। আমার আচরণে আমার মা-বাবা ভাইবোনরা খুব কষ্ট পেতো। কিন্তু তাদের চোখের জলও আমাকে আমার অটল সিদ্ধান্ত থেকে টলাতে পারতো না। চারদিকে রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছিল যে, আমি পাগল হয়ে গেছি। আমার পাগল হয়ে যাবার খবর শুনে দূর থেকেও মানুষ আমাকে দেখতে আমাদের বাড়িতে এসে ভিড় করতো। আমি দেখা দিতাম কিন্তু পারতপক্ষে কারও সঙ্গে কথা বলতাম না। ঐরূপ মানসিক ভারসাম্য হারানো অবস্থার মধ্যেই আমার অনেকগুলো দিন কেটে যায়।

১৫ আগস্টের পর মোশতাক সরকারের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করার পর জেনারেল শফিউল্লাকে সরিয়ে দিয়ে তাঁর জায়গায় জেনারেল জিয়াউর রহমানকে সেনাপ্রধান নিযুক্ত করা হয়েছিল। তাতে বোঝা যায়, জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বিশ্বাস অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন। তারপরও জিয়া সম্পর্কে আমার প্রত্যাশার অবসান না হওয়াটাকে কেউ কেউ যুক্তিহীন বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাদের কথা হলো, ১৫ আগস্টের অব্যবহিত পর ইনফরমেশন গ্যাপের কারণে জিয়া সম্পর্কে আমার প্রত্যাশাকে কিছুটা সত্য বলে ধরে নিলেও, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর পার হয়ে নভেম্বরে পৌঁছেও খুনিদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তিনি বঙ্গবন্ধুর পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করবেন; জিয়া সম্পর্কে এমন কথা ভাববার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণই আর অবশিষ্ট ছিল না। জিয়া যে মোশতাক ও তাঁর সূর্যসন্তানদের খুব কাছের মানুষ ——তা নাকি নানাভাবেই জানা যাচ্ছিল।

আমার মনে হয়, বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার পরের ঘটনাপ্রবাহ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেবার কারণেই আমার ক্ষেত্রে আরও বড় রকমের একটি ইনফরমেশন গ্যাপ ঘটে থাকবে। এ কারণেই স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের পাঠক, মেজর জিয়া (পরে জেনারেল) সম্পর্কে আমার মোহভঙ্গ হয়েছিল অন্যদের চাইতে কিছু পরে। সে-কারণেই বঙ্গবন্ধুর অনুসারী হিসেবে আমার মনে জিয়ার পরমায়ু অন্যদের তুলনায় কিছুদিন বেশি স্থায়ী হয়েছিল।

খালেদ এবং জিয়ার মধ্যকার বন্ধুত্বের কথা আমি লোকমুখে শুনেছি। পাকিস্তানের কাবুল মিলিটারি একাডেমিতে তাঁরা একই সঙ্গে কর্মরত ছিলেন। যখন আমি জানতে পারলাম, জিয়া এই অভ্যুত্থানের সঙ্গে নেই—এবং বিগ্রেডিয়ার খালেদ জিয়াকে গৃহবন্দি করে রেখেছেন, তখন আমি খুবই দুঃশ্চিন্তায় পড়ে যাই। আমি ১৫ আগস্টের খুনি সৈনিকদের সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। আমার মনে হয়েছিল, এরা সবাই পাকিস্তানপন্থী হবেন। কিছুসংখ্যক লোক দেখানো মুক্তিযোদ্ধা এদের সামনে থাকলেও, পাকিস্তান ফেরত প্রবীণ সৈনিক এবং মুসলিম

লীগের কিছু রাজনীতিবিদ নিশ্চয়ই এদের পেছনে লুকিয়ে আছে। সময় ও সুযোগ বুঝে তারা ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করবে। জিয়া ও খালেদের মতো মুক্তিযোদ্ধারা যদি ১৫ আগস্ট ও ৩ নভেম্বরের অভিন্ন-খুনিদের বিরুদ্ধে একজোট হতে না পারে, তবে বঙ্গবন্ধুর অনুসারীদের পক্ষে পুনরায় জয়ের ধারায় ফিরে আসতে পারাটা খুবই কঠিন হবে। মাঝখান থেকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিটি দুই ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়বে।

৩

বঙ্গবন্ধু ও চার জাতীয় নেতার খুনিদের পক্ষে আমেরিকা-চীন- লিবিয়া-সৌদি আরব যতটা আছে- খুনিদের বিরুদ্ধে ভারত বা সোভিয়েত ইউনিয়ন ততটা পজেটিভলি নেই। তাই পরিবর্তিত বিশ্ব- পরিস্থিতিটা এই মুহূর্তে আমাদের অনুকূলে নেই। তাছাড়া, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) গঠন করা এবং চারটি পত্রিকা রেখে বাকি সমস্ত কাগজ বন্ধ করে দেবার কারণে, দেশের মানুষও কিছুটা বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। মানুষ ভালো করে বুঝে উঠতে পারছিল না, বাকশাল গঠন করে বঙ্গবন্ধু আসলে কী করতে চেয়েছিলেন। আওয়ামী লীগ ভেঙ্গে গিয়েছিল ঠিকই কিন্তু দেশের সমমনা রাজনৈতিক দলগুলোর সমন্বয়ে গঠিত বাকশাল তখনও ক্ষতস্থানকে প্রোটেক্ট করার মতো শক্ত চামড়া নিয়ে গড়ে উঠতে পারেনি। বঙ্গবন্ধুর অনুসারীদের ঐ-রূপ অসংগঠিত অবস্থার মধ্যে খুনিরা ১৫ আগস্ট ও ৩ নভেম্বরের ঘটনার নজিরবিহীন নিমর্মতার সুফলও ভোগ করছিল উপরি- পাওয়া হিসেবে। আমার মতো অনেকেই তখন ভয়ে হোক, ঘৃণায় হোক বা অক্ষম অভিমানেই হোক নিজের ভিতরে সেঁধিয়ে গিয়েছিল। আপনা থেকে বাহির হয়ে ঘৃণার কৃপাণ হাতে খুনির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার শক্তি তখনও অনেকেই সঞ্চয় করে উঠতে পারেনি। যেহেতু আমি অভ্যুত্থানের সঙ্গে মনে-মনে নিজেকে যুক্ত করে ফেলেছিলাম, সেহেতু অভ্যুত্থানটিকে খুব ধীর গতিতে অগ্রসর হতে দেখে আমি খুব ভীত হয়ে পড়ি। চারদিকে আতঙ্ক। কী হবে না হবে তা কেউ-ই বলতে পারছে না। সংশয় সর্বত্র পাখা মেলে আছে। বিদেশি সংবাদ মাধ্যমই তখন আমাদের প্রধান সংবাদ ভরসা। সারাক্ষণ রেডিও খুলে আমি আর মহাদেব বাসায় বসে থাকি। জিয়া যে বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রশ্নে খালেদ ও শাফায়েত জামিলের সঙ্গে একমত নন, তা ক্রমশ আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে আসে। জিয়ার দিকে আমার খুব রাগ হয়। আমার মনে হয় জিয়া ভুল করছেন। জিয়ার প্রতি আমার যে বিশ্বাস ছিল তা দ্রুতই ভেঙে যেতে থাকে।

ব্রিগেডিয়ার খালেদকে নিয়েও আমার মনে সংশয় দেখা দেয় দুটো কারণে।

১. ১৫ আগস্ট ও ৩ নভেম্বরের জেল হত্যার সঙ্গে যুক্ত সামরিক অফিসারদের তিনি দেশ থেকে নির্বিবাদে পালিয়ে যেতে দিলেন কেন?

(পরে জেনেছিললাম, খালেদ মোশাররফ জেল-হত্যার বিষয়টি সময়মতো জানতেন না। মিসেস মোশাররফ খালেদের প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী, খালেদ মোশাররফ পরদিন ৪ নভেম্বর জেলখানায় নিহত চার জাতীয় নেতাকে দেখতে যান। তথাকথিত 'সূর্যসন্তানদের সঙ্গে যখন খালেদ মোশাররফের প্যাকেজ ডিল হয়, তখন জেল-হত্যার বিষয়টি সম্পর্কে অবগত থাকার পরও জেনারেল ওসমানী, মেজর জেনারেল খলিলুর রহমান এবং তৎকালীন ডিআইজি অব পুলিশ ই.এ. চৌধুরী খালেদের কাছ থেকে ঐ তথ্যটি গোপন করেছিলেন।)

২. তিনি যদি আওয়ামী লীগের সমর্থকই হবেন, তবে জেলে নিহত জাতীয় চার নেতাকে সম্মানের সঙ্গে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের নিকটবর্তি তিন-নেতার কবরের পাশে কবর দেবার ব্যবস্থা করলেন না কেন? আমার স্পষ্ট মনে আছে, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের পাশে তিন নেতার কবরের দক্ষিণের ফাঁকা জায়গাটিতে চার নেতাকে মর্যাদার সঙ্গে সমাহিত করার জন্য চারটি কবর খোঁড়া হয়েছিল। আমি ঐ খোঁড়া কবরগুলোকে চোখে চোখে রাখছিলাম। অপেক্ষা করছিলাম, কখন ঐ চার নেতার লাশ এখানে আনা হবে। আমার খুব ইচ্ছে ছিল চার নেতার দাফনে শরিক হবার। তাঁদের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করার। কিন্তু আমার সে ইচ্ছে সেদিন পূরণ হয়নি। সন্ধ্যার পরও নেতাদের লাশ সেখানে আনা হয়নি। পরে খোঁড়া কবরগুলো মাটি দিয়ে পুনরায় ভরাট করে ফেলা হয়।

পরে, ৫ নভেম্বর সন্ধ্যায়, চার নেতার মধ্যে তিন নেতাকে বনানী কবরস্থানে বঙ্গবন্ধু এবং সেরনিয়াবাতের পরিবারের নিহত-সদস্যদের পাশেই দাফন করা হয়। শহীদ কামরুজ্জামানের লাশ রাজশাহীতে তাঁর পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়।

ঘটনাদৃষ্টে মনে হয়, ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানের বলি হয়েছেন এই চার জাতীয় নেতা।

সেনাবাহিনীর মধ্যে 'চেইন অব কমান্ড' প্রতিষ্ঠিত হলে ভেঙ্গে পড়া সাংবিধানিক চেইন অব কমান্ডও যে স্বাভাবিকভাবেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে—, সে-কথা বুঝতে পেরেই জেলের ভিতরে বন্দি চার নেতাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল মোশতাক এবং তার সহযোগীরা। সেনাবাহিনীতে চেইন অব কমান্ড প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ না নিলে, ঐ চার নেতা হয়তো বেঁচে যেতে পারতেন তাই বলতে হয়, ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানকারীরা জেলের ভিতরে বন্দি চার জাতীয় নেতার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ব্যাপারটিকে অগ্রাধিকার না দিয়ে সেদিন অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। পরে, ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানের পরোক্ষ বলি, জাতীয় চার নেতাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তিন নেতার কবরের পাশে কবর না দেয়ার বিষয়টিও আমাকে খালেদ মোশাররফ ও তাঁর সহযোগীদের রাজনৈতিক বিশ্বাস সম্পর্কে কিছুটা সন্দিহান করে তুলেছিল। মর্যাদাপূর্ণ ঔ জায়গাটিতে চার নেতাকে সমাহিত করার পথে কোথায় বাধা ছিল—তা আমরা বুঝে উঠতে পারিনি। আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, তবে কি সামরিক বাহিনীতে চেইন অব কমান্ড পুনঃপ্রতিষ্ঠার 'সীমিত লক্ষ্য'-কে সামনে নিয়েই খালেদ মোশাররফ এই অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিলেন? দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে অপটু একজন দুর্বলচিত্তের জেনারেল হিসেবে খালেদ যখন চিহ্নিত হতে চলেছেন, তখন আমাদের কানে আসে কর্নেল শাফায়েত জামিলের নাম। আমরা শুনতে পাই, শাফায়েত জামিল বঙ্গভবনে গিয়ে খুনি মোশতাককে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলেন। তখন জেনারেল ওসমানী সাহেব বুক পেতে মোশতাকের সামনে দাঁড়িয়ে শাফায়েত জামিলের রুদ্ররোষ থেকে মোশতাককে প্রাণে রক্ষা করেন এমন ঘটনার কথা তখন প্রেসক্লাবে শোনা যাচ্ছিল। সেদিন 'নো মোর ব্লাড' তত্ত্ব হাজির করে ওসমানী সাহেব মোশতাকসহ বঙ্গবন্ধুর খুনিদের রক্ষাকর্তা হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার সংবাদ শুনে আমাদের খুবই খারাপ লেগেছিল।

একসময় জাসদের পত্রিকা গণকণ্ঠে কাজ করেছি। জাসদের, অনেক নেতার সঙ্গে চেনাজানা আছে। ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে প্রেসক্লাবে তাদের অনেককেই খুব তৎপর বলে মনে হলো। তখন একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিলাম, ঐ অভ্যুত্থানের পক্ষে বা বিপক্ষে কেউই খুব সরব ছিলেন না। একটা অনিশ্চিয়তা আমার ও মহাদেবের মতো অন্য অনেকের মনকেই ঘিরে রেখেছিল। জাসদের অনেক বন্ধুকে তখন খালেদের বিরুদ্ধে তৎপর হতে দেখছিলাম—তার অর্থ যে ঐ ঘটনার ভিতরে কর্নেল তাহেরের সম্পৃক্ততার সূচক, তা আমরা জানতাম না। তবে ঐ অভ্যুত্থানকে ভারতীয় স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত করে প্রচার চালানোর বিষয়টি যে খুবই কৌশলের সঙ্গে করা হচ্ছিল— তা আমি এবং মহাদেব বুঝতে পারছিলাম এ কারণে যে, আমাদের কাছে ঘেঁষতে দেখে প্রেসক্লাবের অনেক টেবিল-আলাপ বন্ধ হয়ে যেতো। এবং আমাদের দিন অর্থাৎ হিন্দুদের দিন এসে গেছে বলে কেউ কেউ আমাদের বিদ্রুপ করতেন। ঐ অভ্যুত্থানের সঙ্গে আমাদের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক না থাকার পরও—এমন মন্তব্যকারীদের সঙ্গেও আমাদের এমন সৌজন্যমূলক আচরণ করতে হতো যে, সত্যিই তাই। এবং আমরা দু'জন এ-কারণে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

৭২ ঘণ্টা চলে যাবার পরও ব্রিগেডিয়ার থেকে জেনারেল ও সেনাবাহিনীর প্রধান (জিয়াকে সেনাপ্রধানের পদ থেকে সরিয়ে দেয়া হয়) পদে উন্নীত খালেদ মোশাররফ যখন বেতার বা টিভি ভাষণের মাধ্যমে তাঁর এ্যাকশনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে দেশবাসীকে কোনো কিছুই বোঝাতে পারলেন না, তখন তাঁর বিরুদ্ধপক্ষের প্রচারণাকেই মানুষ সত্য বলে ধরে নিতে শুরু করলো। ভিতর থেকে বন্দি জেনারেল জিয়ার নিষ্ক্রিয় অসহযোগিতা এবং বাইরে থেকে কর্নেল তাহেরের সক্রিয় প্রতিরোধের কারণে, তিনি যে সেনাবাহিনীকে নিজের অনুকূলে আনতে ব্যর্থ হয়েছেন— সেকথা আমরা যারা তাঁর সমর্থক, তারা ভয়ে ভয়ে ভাবতে থাকলাম বটে—কিন্তু সাধারণ মানুষ ষড়যন্ত্রকারীর নীরবতার সঙ্গেই খালেদের নীরবতার মিল খুঁজে পেলো।

বঙ্গবন্ধুহীন বাংলাদেশের প্রতি ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে— তা আমাদের জানা ছিল না। ফলে, আমরাও খুব আশঙ্কার মধ্যে ছিলাম।

বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর থেকেই মানুষ ভারতের দিকে এক চোখ সতর্ক রেখেছিল। ১৫ আগস্টের ‘সূর্যসন্তানদের’ শায়েস্তা করার লক্ষে গৃহীত খালেদ মোশাররফের অভ্যুত্থানের পর ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী চুক্তিটি নিয়ে দেশের মানুষের মধ্যে আশঙ্কাভাব আরও বৃদ্ধি পায়। মনে হতে থাকে, এই বুঝি ভারতীয় সেনারা ঢাকা ঢুকে পড়লো। এই বুঝি আকাশ পথে ছুটে এলো ভারতীয় বিমান। এরকম সম্ভাবনার কথাই তখন চারদিকে প্রচারিত হতে থাকে। ঐ সংগঠিত প্রচারণার মোকাবিলা করার শক্তি তখন, আগেই বলেছি, বঙ্গবন্ধুর অসংগঠিত অনুসারীরা অর্জন করতে পারেননি। আমি আর মহাদেব তখন রাত জেগে এরূপ ভাবতে বাধ্য হই—ভারত যদি রাজনৈতিক কোনো উচ্চাভিলাষ থেকে বাংলাদেশের এই সংকটের মধ্যে জড়িত হয়ে ফায়দা লুটতে চায়, বা ভগবান না করুন, অন্য কোনো কারণেও জড়িত হয়ে পড়ে, তাহলে বাংলাদেশের হিন্দুরাই তার প্রথম বলি হবে। আমরা প্রার্থনা করি, খুনিচক্র ও তাদের স্বাধীনতা বিরোধী সমর্থকদের হাতে বাংলাদেশের নিরীহ হিন্দুদের জিম্মি করে ভারত যেন এমন কাজ কখনও না করে।

আমাদের প্রার্থনাই সত্য হয়। ভারত আমাদের কথা রাখে। বঙ্গবন্ধুকে বাঁচাতে যেমন ভারত কোনো ভূমিকা রাখেনি: খালেদ মোশাররফকে বাঁচানোর জন্যও ভারত কোনো ভূমিকা রাখে না। অথচ ভারত-জুজুর ভয় দেখিয়েই খালেদের বারোটা বাজিয়ে দিতে সক্ষম হয় খালেদের বিরুদ্ধবাদীরা। খালেদের হাত থেকে দেশকে উদ্ধার করা আর ভারতের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করা সমার্থক—এমন প্রচারিত বাস্তবতার মধ্যে খালেদের পক্ষে জয়ী হওয়া তখনই সম্ভব যদি সত্যি- সত্যিই ভারত তাঁর পাশে এসে দাঁড়াতো। কিন্তু তা আর সম্ভব ছিল না। কেননা আমরাই তো একইসঙ্গে খালেদের জয় এবং নিজেদের নিরাপত্তা কামনা করছিলাম। আমাদের নিজেদের অস্তিত্বের স্বার্থেই আমরা তখন ভারতীয় অনুপ্রবেশের ভয়ে ভীত। ঐরকমের হাত-পা বাঁধা অবস্থায় খালেদ মোশাররফ ও তার সহযোগীদের জন্য তখন আমাদের বুকের ভিতরে এক ধরনের মায়া তৈরি হয়। ভাবি, কী প্রবল দুশ্চিন্তার মধ্যেই না অভ্যুত্থানের ঐ নেতারা প্রহর গুনছেন। তাঁদের একটি মহৎ প্রয়াস কী করুণ পরিণতির পথেই না এগিয়ে চলেছে। বিবিসি-র রাতের খবরে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে খালেদের পাল্লা ভারী বলে বলা হলেও আমাদের মনের সংশয় তাতে দূর হয় না। আমরা উদ্বেগ নিয়েই ৬ তারিখ রাতে ঘুমাতে যাই।

আমাদের সমগ্র সত্তাকে ভয়ে কাঁপিয়ে দিয়ে, বিগত বিনিদ্রপ্রায় রজনীর সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে, ৭ই নভেম্বরের ভোর আসে। পিলখানার ভিতর থেকে রাইফেলের গুলি ছুঁড়তে-ছুঁড়তে, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাপূর্ণ শ্লোগান ছড়িয়ে বেরিয়ে আসে জোয়ানরা। তাদের কণ্ঠে ‘নারায়ে তকবির আল্লাহু আকবর’ ধ্বনি। সারা আজিমপুর জেগে উঠে উল্লাসে। সেই উল্লাস সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ে। ছড়িয়ে পড়ে পরাজিত জেনারেল খালেদের হাত থেকে জেনারেল জিয়ার ক্ষমতা উদ্ধারের সংবাদ। জিয়া গৃহবন্দি হওয়ার পর মোশতাক ক্ষমতা হারিয়েছিলেন। খালেদ-শাফায়েত খুনি মোশতাককে হটিয়ে প্রধান বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমকে রাষ্ট্রপতি করেছিলেন। মোশতাকসহ বঙ্গবন্ধুর খুনিদের সঙ্গে জেনারেল জিয়ার যে দূরত্বটুকু এতদিন বজায় ছিল; ৭ নভেম্বরে সকালের আলো ফুটবার সঙ্গে সঙ্গেই তা ঘুচে যায়। তখন জিয়া ও মোশতাকের অনুগত সৈনিক ও বঙ্গবন্ধু বিরোধী নগরবাসীর মুখে-মুখে জিয়ার পাশাপাশি মোশতাকের নামেও জয়ধ্বনি ওঠে। জিয়া-মোশতাক ভাই ভাই। চারদিকে ভারতের হাত থেকে দেশটিকে এইমাত্র মুক্ত করা হয়েছে—এমন মনোভাব প্রকাশিত হতে থাকে। আমরা বাইরে গিয়ে বিডিআর থেকে বেরিয়ে যাওয়া সৈনিকদের বিজয় উল্লাস দেখবার সিদ্ধান্ত নিই। তখনই ‘ভারত-রাশিয়ার দালালেরা হুশিয়ার সাবধান’ বলে আমাদের থামিয়ে দেয়া হয়। আমরা ৪ নভেম্বরের মৌন-মিছিলে অংশ নিয়েছিলাম। মনে-মনে মোশতাক ও জিয়ার বিনাশ কামনা করেছি। সুতরাং আমরা ঘরের মধ্যে বসে থাকলাম। আমাদের রক্তশূন্য ভীত মুখ দেখে মহাদেবের স্ত্রী নীলা আমাদের ঘরের বাইরে না যাবার পরামর্শ দিলো। কিন্তু আমি স্থির করলাম, আমি যাবো। না গেলে আমার

বিপদ হতে পারে। ঐ দিনই দুপুরে রেডিওতে আমার কবিতা পড়ার কথা। আগের দিন আমি অনুষ্ঠানের প্রযোজকের কাছে আমার কবিতা জমা দিয়ে এসেছি। আমার জমা দেয়া কবিতাগুলোতে ১৫ আগস্টের ঘটনার শোকাচ্ছন্নতা রয়েছে। প্রিয়জন-হত্যার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার প্রস্তুতি গ্রহণের কথাও বলা হয়েছে। আমার কবিতাগুলো ছিল— ১. যীশু ক্রুশ। ২. প্রস্তুতি। (পরে ঐ কবিতা দুটো 'ও বন্ধু আমার' [প্রকাশকাল : ডিসেম্বর ১৯৭৫] নামক কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়।) অন্য কবিতাটির কথা মনে নেই। তিনটি কবিতা আমি জমা দিয়েছিলাম ভাবলাম, এখন আমি যদি ঐ কবিতাগুলো পড়তে না যাই, তবে ভাবা হতে পারে যে, আমি খালেদ মোশাররফের ক্যু'র প্রশ্রয়েই এই কবিতাগুলো লিখেছিলাম। এখন খালেদ পরাজিত হওয়াতে আমি ভয় পেয়ে গেছি। তাই কবিতা পড়তে যাইনি। অথচ আমার এ-কবিতাগুলো আমি লিখেছিলাম আমার গ্রামের বাড়িতে বসে। আমার কবিতাগুলোর উৎসশক্তি সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করা হোক—আমি তা হতে দিতে পারি না। তাই মহাদেব এবং নীলার নিষেধ সত্ত্বেও আমি দুপুর বারোটার দিকে শাহবাগের দিকে যাই। স্থির করলাম পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রেডিওতে আমার কবিতা যদি পড়তে পারি তো পড়বো—তারপর আমার কবিবন্ধু আবুল হাসানকে পিজিতে দেখতে যাবো। ৪ নভেম্বর অসুখ বেড়ে যাওয়ার কারণে আবুল হাসান পিজি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে।

রেডিওতে যাবার পথে উল্লাসরত সৈনিক ও জনতার ট্রাকমিছিল এবং রাজপথে কিছু ট্যাংক চলতে দেখা গেলো। সিপাহী-জনতা ভাই ভাই শ্লোগানটি তখনই এক দুবার শুনলাম। তারা কেউ কেউ আমাকেও মিছিলে যোগ দিতে ডাকলো; কিন্তু আমি গেলাম না। আমি গেলাম রেডিও অফিসে। সেখানে গিয়ে দেখি এলাহি কান্ড। ট্যাংক নিয়ে সৈনিকেরা ঘিরে রেখেছে রেডিও অফিসটি। আমি বুকে সাহস সঞ্চয় করে গেটের দিকে এগিয়ে গেলাম। দোতলায় দাঁড়িয়ে, আমাকে রেডিওতে ঢুকতে দেখে আমার প্রযোজক একজন পিয়নকে আমার কাছে পাঠালেন। আমি তাঁকে চিনতাম না, কিন্তু তিনি আমাকে চিনতেন। তিনি আমার কাছে এসে আমাকে টেনে গেটের বাইরে নিয়ে গেলেন।

বললেন, দাদা, আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে?

আমি বললাম কেন, আমি আমার কবিতা পড়তে এসেছি। আমার তো প্রোগ্রাম আছে দুপুরে।

তিনি বললেন, আপনার নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়েছে। আপকি কি দুনিয়াদারির কোনো খবর রাখেন না নাকি?

আমি বললাম, কেন? কি খবর?

তিনি জানালেন, প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক এখন রেডিওর ভিতরে আছেন। তিনি এসেছিলেন জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে। কিন্তু কর্নেল তাহের তাঁকে কিছুতেই ভাষণ দিতে দেবেন না। তিনি মোশতাককে টয়লেটের মধ্যে বন্দি করে রেখেছেন। সবাই এখন জিয়ার জন্য অপেক্ষা করছে। আপনি তাড়াতাড়ি বাসায় চলে যান। কখন কী হয় কিছু বলা যায় না। আপনি নিজেও মরবেন, আমাদেরও মারবেন।

ডুবন্ত মানুষ যেমন খড়কুটোকে আশ্রয় করে বাঁচবার শেষ- চেষ্টা করে, আমার অবস্থাও অনেকটা সেরকম। খালেদ মোশাররফের ওপর বাজি ধরে হেরে যাবার পর— আমি এবার বাজি ধরলাম কর্নেল তাহেরের নামে। তাহের মোশতাককে পায়খানার মধ্যে আটকে রেখেছেন, তাকে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে দেননি ঐ আনন্দ সংবাদটি শুনে আমার খুব ভালো লাগলো। ঐ কথা শুনে আমি কর্নেল তাহেরকে মনে মনে খুবই তারিফ করলাম। আমার বাড়ি নেত্রকোনায়। তাহেরও নেত্রকোনার মানুষ। ভাবলাম, এই যুদ্ধে তাহের জিতলেও মন্দ হয় না।

৩ নভেম্বর বঙ্গভবনে আয়োজিত এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে একই সঙ্গে জেনারেল এবং সেনাবাহিনীর প্রধানের পদে উন্নীত হওয়ার সময় খালেদ মোশাররফ ঘুনাক্ষরেও ভাবতে পারেননি যে, তাঁর জেনারেলের ব্যাজ সম্বলিত এই পোশাক এবং সেনাপ্রধানের নতুন পদটি

— এতটাই ক্ষণস্থায়ী হবে। মাত্র তিন দিনের ব্যবধানে, ক্ষমতার দ্বন্দ্বে পরাভব মেনে, ঐ পোশাক ছেড়ে সিভিল পোশাক পরিধান করে তাঁকে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ছুটতে হবে জীবন বাঁচানোর জন্য। তিনি তাঁর দুই বিশ্বস্ত সহযোগী কর্নেল নাজমুল হুদা এবং লে. কর্নেল হায়দারকে নিয়ে ভোরের দিকে শেরে বাংলা নগরস্থিত ১০ম বেঙ্গল রেজিমেন্টে গিয়ে আশ্রয় নেন। জেনারেল খালেদ হয়তো ভেবেছিলেন, তিনি যেমন গত চারদিন ধরে জেনারেল ওসমানী সাহেবের 'আর রক্ত নয়' দর্শনটি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেছেন, তেমনি অভ্যুত্থানজয়ী জেনারেলরাও নিশ্চয়ই ঐ ওসমানী- দর্শন মেনে চলবেন। তাই তিনি শেরে বাংলা নগরের ১০ম বেঙ্গল রেজিমেন্টে আশ্রয় নিয়েছিলেন আত্মবিশ্বাস থেকে। ঐ রেজিমেন্টটি মুক্তিযুদ্ধকালীন 'কে' ফোর্সের সদস্যদের নিয়ে গঠিত ছিল। কিন্তু হায়রে বিশ্বাস। মোশতাককে বাঁচানোর জন্য বঙ্গভবনে যেমন ওসমানী সাহেব সর্বদা উপস্থিত ছিলেন, খালেদ ও তাঁর সহযোগীদের বাঁচানোর জন্য শেরে বাংলা নগরে সেরকম কোনো ওসমানী উপস্থিত ছিলেন না। ফলে, ৭ নভেম্বর সকাল ১১ টার দিকে ঊর্ধ্বতন সামরিক অফিসারের নির্দেশমতো অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় নিম্নস্তরের সামরিক অফিসাররা গুলি ও বেয়নেট চার্জ করে ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানের নেতৃত্বদানকারী তিন বীর- মুক্তিযোদ্ধাকে নির্মমভাবে হত্যা করে।

[সূত্র : কর্নেল (অবঃ) শাফায়েত জামিল, ভোরের কাগজ, ৭ নভেম্বর ১৯৯৬]।

আমি অবশ্য শুনেছিলাম যে, ক্যান্টনমেন্টের কাছেই, এখানকার আর্মি স্টেডিয়ামের সামনে, পথের ওপর খেজুর গাছের নিচে খালেদ মোশাররফের লাশ পড়ে আছে। কারাগারে নিহত জাতীয় চার নেতার লাশ যথার্থ মর্যাদায় শেরে বাংলা ও সোহরাওয়ার্দীর কবরের পাশে দাফন না করার জন্য দু'দিন আগে যাকে অভিযুক্ত করেছিলেন, দু'দিন পর তাঁর লাশ রাস্তার ওপর পড়ে থাকার সংবাদ শুনে আমি সেই অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিলাম। বুঝতে পারলাম, অভ্যুত্থান করলেও, তিনি সেনাবাহিনীর ভিতরের পরিস্থিতিকে পুরোপুরি নিজ-নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেননি। অভ্যুত্থান-উত্তর সেনাবাহিনীর মধ্যকার বেসামাল অবস্থার কাছে তিনি খুবই অসহায় হয়ে পড়েছিলেন। তাই চার নেতাকে বনানীতে পাঠিয়ে দিয়ে হয়তো প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছিলেন যে, আওয়ামী লীগের নেতাদের প্রতি তাঁর বিশেষ কোনো দুর্বলতা নেই। বঙ্গবন্ধুর রুহের মাগফেরাত কামনা করার জন্য সংগ্রামী ছাত্র সমাজ কর্তৃক আয়োজিত ৪ নভেম্বরের মৌন মিছিলের সঙ্গে তাঁর মা ও ভাইয়ের সম্পর্ক থাকলেও, তাঁর নিজের কোনোরূপ সম্পর্ক ছিল না— এটি প্রমাণ করাটাও হয়তো তাঁর জন্য তখন জরুরি হয়ে পড়েছিল। দু'দিনের ব্যবধানে তাঁকেও যে ঐ বনানী কবরস্থানে, চার জাতীয় নেতার পাশেই অন্তিম-শয়নে শায়িত হতে হবে, তা অন্তরাল থেকে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন যে ঈশ্বর, তিনি ছাড়া কে আর ভাবতে পেরেছিলো। আমার কী যে খারাপ লাগলো। আমার বুকের ভিতরটা গোপনে কেঁদে উঠলো। কেঁপে উঠলো। হায় কী দুর্ভাগ্য! আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের এ কী করুণ পরিণতি। হা ঈশ্বর, তাঁরা কি এভাবেই এক এক করে শেষ হয়ে যাবেন?

খালেদকে সহায়তা করার জন্য রংপুর ক্যান্টনমেন্ট থেকে ঢাকায় ছুটে এসেছিলেন কর্নেল নাজমুল হুদা। মেজর হায়দার (পরে লে. কর্নেল) বিমান বাহিনীর এ আর খন্দকারের সঙ্গে পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে মুক্তিবাহিনীর প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন রেসকোর্সে, ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরে। তিনি ছুটিতে থাকা অবস্থায় ঢাকায় খালেদের সঙ্গে দেখা করতে এসে ঘটনার ভিতরে জড়িয়ে পড়েছিলেন। নিশ্চিত পরাজয়ের মুখে বন্ধু খালেদের সঙ্গ আর ত্যাগ করতে পারেননি। একেই বলে বন্ধুত্বের টান।

রেডিও থেকে বেরিয়ে, আমি আমার বন্ধু আবুল হাসানের টানে তার সঙ্গে দেখা করার জন্য পিজি হাসপাতালে যাই। হাসান খুবই অসুস্থ। তাঁর শেষ-জীবনের বান্ধবী কবি সুরাইয়া খানম তখন পিজিতে হাসানের দেখাশোনা করছিল। সুরাইয়া কবিতা লিখতো এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে শিক্ষকতা করতো। শামসুন্নাহার হলের হাউস টিউটরও

ছিলো। হাসানের কাছে তখন আর কে ছিল, ঠিক মনে পড়ছে না। হাসানের আম্মা এবং ওর বোন বুড়িও হয়তো ছিল।

আমার কাছে লেখা হাসানের শেষ চিঠিতে হাসান তাঁর বান্ধবী সুরাইয়া সম্পর্কে লিখেছিল...'ঐ শ্রীমতীও এখন আর আমাকে একাকীত্ব দিতে পারেন না।'

[দ্র: আবুল হাসানের শেষ চিঠি : সচিত্র সন্ধানী : ২৬ নভেম্বর ১৯৭৮]

সুরাইয়া কি জানতো তাঁকে নিয়ে হাসানের ঐ উপলব্ধির কথা? হয়তো জানতো না ঠিক, তবে বুঝতে পারতো। আমার আর হাসানের অন্তর্গত সম্পর্কের গভীরতাটুকু সুরাইয়ার না জানার, বা না বোঝার কোনো কারণ ছিল না। ফলে, হাসানের কাছ থেকে সে আমাকে যতটা সম্ভব দূরে রাখার চেষ্টা করতো।

সুরাইয়া ছিল মুজিব-বিরোধী। বাইরে একটু বিদ্রোহী ভাব থাকলেও মনে-মনে আমি ছিলাম খুবই মুজিবভক্ত। ষাটের দশকের শুরুতে, অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদী রাজনীতির কারণে শেখ মুজিবকে ঘিরে আমার মধ্যে ঐ ভক্তি ভাবটার সৃষ্টি হয়েছিল। পরে, আমার ক্ষণস্থায়ী বিশ্ববিদ্যালয়-জীবনের সহপাঠিনীরূপে আবির্ভূতা মুজিবনন্দিনী আমার ঐ ভক্তিকে প্রেমে পরিণত করার ক্ষেত্রে পরোক্ষ ভূমিকা রাখেন। আমার কারণে কমবেশি আবুল হাসানও ঐ প্রেমে জড়িয়ে পড়েছিল। তবে, রাজনৈতিক অর্থে আবুল হাসানকে আমার মতো মুজিবভক্ত অবশ্যই বলা যাবে না। আসলে রাজনীতি সম্পর্কেই হাসানের এক-ধরনের নিরাসক্তি ছিল। হাসানের পিতা, একজন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা ছিলেন। বিখ্যাত মুসলিম লীগ নেতা ঢাকার হাবিব ফকিরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। পার্টিশনের আগে কলকাতায় তাঁরা একসঙ্গে থাকতেন। পিতার সঙ্গে বন্ধুত্বের কারণেই আবুল হাসান ঢাকায় এসে প্রথমদিকে হাবিব ফকিরের বাসায় থাকতো। আমিও হাসানের সঙ্গে হাবিব ফকিরের বাসায় একাধিকবার রাত কাটিয়েছি। তাঁর মুসলিম লীগ ভাবাপন্ন পিতার সঙ্গে অগ্রবর্তি সময়ের মতাদর্শগত বিরোধ এড়াবার জন্যই কি হাসান রাজনীতি থেকে নিজেকে গুটিয়ে রাখতো? কে জানে?

জানি, দুরারোগ্য ব্যধির চিকিৎসা-সুবিধার কথা বিবেচনা করেই বাকশাল হওয়ার পর আবুল হাসান বাকশালে যোগ দিয়েছিল। আবুল হাসান বাকশালের ওপর আস্থা স্থাপন করে বাকশালে যোগ দিয়েছিল, এমন নয়। আগের বছর, চিকিৎসার জন্য সরকারী আনুকূল্যে জিডিআর যাবার সময়ই আওয়ামী লীগ সরকারের সঙ্গে আবুল হাসানের একটা কৃতজ্ঞতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক ইউসুফ আলী চিকিৎসার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে আবুল হাসানকে পাঁচ হাজার টাকা অনুদান দিয়েছিলেন, যা টিভি-সংবাদে প্রচারিত হয়েছিল।

কথাশিল্পী-সাংবাদিক জনাব রাহাত খান, বাংলা একাডেমীর তৎকালীন পরিচালক শামসুজ্জামান খান এবং সাহিত্যিক-রাজনীতিক মরহুম খন্দকার মুহম্মদ ইলিয়াস আমাকে বাকশালে যোগ দিতে অনুরোধ করেছিলেন—কিন্তু আমি বাকশালে যোগ দিইনি। আমার মনে হয়েছিল, বঙ্গবন্ধু বাকশাল গঠন করে একটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ এবং অসময়োচিত পদক্ষেপ নিয়েছেন। বাকশাল গঠনের ভিতর দিয়ে তিনি তাঁর ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করতে চাচ্ছেন—আমার মনে হয়েছিল, ঐরূপ অভিযোগ তুলে বিরোধী মহল এখন মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারবে। বাকশাল গঠনের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমার নিজের মনেও কিছু সংশয় ছিল। তা ছাড়া, কোনো রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হওয়ার ব্যাপারে আমার মনের দিক থেকে সায় ছিল না। আমি ভাবতাম, এখনও ভাবি, বড় রকমের জাগতিক দায়িত্ব পালনের জন্যই কবির কর্তব্য হলো, ছোট ধরনের যাবতীয় দায়বদ্ধতা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা। কবির অবিনাশত্ব এবং সার্বভৌম-সয়ম্ভূতা সম্পর্কে আমি খুব তরুণ বয়স থেকেই ছিলাম অতিমাত্রায় সচেতন।

কবি শামসুর রাহমান এবং কবি মহাদেব সাহাও কাছাকাছি ধারণা পোষণ করতেন। তাঁরাও বাকশালে যোগদান করেননি। তবে ঐ দুজনের বাকশালে না-যোগদানের পটভূমি

এক ছিল না। মহাদেব সাহা বঙ্গবন্ধুর ভক্ত ছিলেন। কিন্তু দৈনিক বাংলার পিকিংপন্থী রাজনৈতিক বৃত্তের ভিতরে বন্দি কবি শামসুর রাহমান, তখন পর্যন্ত ছিলেন মওলানা ভাসানীর ভক্ত।

অন্য প্রধান কবিদের মধ্যে কবি শহীদ কাদরী এবং আল মাহমুদ বাকশালে যোগ দিয়েছিলেন। শহীদ কাদরী তখন একটি মস্কোপন্থী ফিচার-সংস্থায় কাজ করতেন। তিনি বাকশালে বিশ্বাসও করতেন। আমার সঙ্গে ১৯৯৩ সালে আমেরিকায় দেখা হয়। ঐ বছর আমরা দু'জন একুশের একটি অনুষ্ঠানের অতিথি হয়ে নিউ ইয়র্কে গিয়েছিলাম অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করতে গিয়ে শহীদ কাদরী বাকশালের পক্ষে কথা বলেছিলেন।

কিন্তু আল মাহমুদের বাকশালে যোগ দেবার সংবাদ শুনে সবাই খুব অবাক হয়েছিল। জাসদের সঙ্গে সকল আদর্শিক সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে, জেল থেকে মুচালেকা প্রদানের মাধ্যমে মুক্তিলাভ করার পরপরই বঙ্গবন্ধুকে গলায় ফুলের মালা পড়িয়ে আল মাহমুদ বাকশালে যোগ দেন। দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত আবুল হাসানের সরকারী আনুকূল্য লাভের বিষয়টিকে আমরা মানবিক সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখতাম। কিন্তু আল মাহমুদের বাকশালে যোগদানের সংবাদে আমরা খুবই কৌতুক বোধ করি। ন্যূনতম অ্যাকাডেমিক শিক্ষাগত যোগ্যতা ছাড়াই বঙ্গবন্ধু তাঁকে শিল্পকলা একাডেমীতে যে উপপরিচালকের চাকরিটি দিয়েছিলেন, বাকশালে যোগ না দেবার কারণে যদি ঐ চাকরিটি চলে যায়, ঐ রূপ কাল্পনিক ভয় থেকেই, মনে হয় আল মাহমুদ ঘটা করে বাকশালে যোগ দেন। তা ছাড়া তাঁর বাকশালে যোগদানের কোনো বিশ্বাসগত কারণ ছিল না। তিনি বঙ্গবন্ধু বা বাকশাল কোনোটাতেই বিশ্বাস করতেন না। তবে তাঁর ঐ বাকশালে যোগদান করার অন্য কোনো কারণ ছিল কি-না, তা আমাদের জানবার কথা নয়।

মনে পড়ে, ১৯৭৩ বা ৭৪ সালে চট্টগ্রামে আমরা কবিতা পড়তে গিয়েছিলাম। শামসুর রাহমান, শহীদ কাদরী, আল মাহমুদ, ফজল শাহাবুদ্দিন এবং আমি। রাতে চট্টগ্রাম পোর্টের ডাক্তার কামালের বাসায় আমাদের নৈশভোজের ব্যবস্থা ছিল। সঙ্গে ছিল সুরা। এক পর্যায়ে শামসুর রাহমানের সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে আল মাহমুদের তুমুল তর্ক বেঁধে যায়। শামসুর রাহমান তর্কপটু মানুষ ছিলেন না। তাই শিল্পী দেবদাস চক্রবর্তী তখন শামসুর রাহমানের পক্ষ হয়ে আল মাহমুদের আক্রমণের জবাব দিতে উঠে দাঁড়ান। আল মাহমুদ যে রব-জলিলের খুঁটির জোরেই আজকাল এমন নর্তন-কুর্দন করছে— দেবুদা ঐ কথাটা জোরের সঙ্গে উত্থাপন করলো, কারও ভুলে যাবার কথা নয় ঐ নয়নমনোহর দৃশ্যটি, আল মাহমুদ তড়াক করে উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে একটি সোফার ওপর লম্ফ দিয়ে উঠে দাঁড়ান। তারপর, মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে, শতকরা একশ' ভাগ সাফল্যের সঙ্গে, পুরোপুরি সামরিক কায়দায় তাঁর তখনকার প্রিয় দুই নেতা রব-জলিলের উদ্দেশে স্যালুট নিবেদন করে বলেন,... 'সেদিন খুব বেশি দূরে নয়, যেদিন সব ব্যাটাই রব-জলিলের নামে এইভাবে স্যালুট দেবে।'

৪

৭৫-এর শুরুতে, ঐ জাসদতাত্ত্বিকের বাকশালে যোগদান করার খবর পাঠ করে, চট্টগ্রামের ঐ রাতের দৃশ্যটি আমার খুব মনে পড়ে গিয়েছিলো। পরে, ৭৫-এর শেষের দিকে, রমনা থানার হাজতে গিয়ে, ক্ষমতার কাছ থেকে ফিরে আসা জাসদের জঙ্গী তরুণকর্মীদের সঙ্গে যখন আমার দেখা হয়, তখনও চট্টগ্রামে দেয়া কবি আল মাহমুদের ঐ-রাতের সদর্প ঘোষণার তাৎপর্য আমি নতুন করে অনুভব করার চেষ্টা করেছিলাম।

অল্পদিনের ব্যবধানেই রব-জলিলের জাসদ ত্যাগ করে বঙ্গবন্ধুর বাকশালে যোগদানকারী কবি আল মাহমুদ, বঙ্গবন্ধুর নিহত হওয়ার পর, ক্ষমতায় আসা জেনারেল জিয়াউর রহমানের সামাজিক সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট—'জাসাস'-এর সভাপতির পদ অলংকৃত করেন।

সুরাইয়া খানম ও আবুল হাসানের মধ্যকার বন্ধুত্বকে প্রেমের সম্পর্কে উন্নীত করার পেছনে আমার একটি খুবই কার্যকর ভূমিকা ছিল। বার্লিন থেকে ফিরে আসার পর, আবুল হাসানের সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে তোলা তাঁর পক্ষে সম্ভব কি-না, তা সহৃদয়চিত্তে ভেবে দেখার জন্য টিএসসি-র সবুজ ঘাসের গালিচায় তিনজন মুখোমুখি বসে, হাসানের পক্ষ থেকে আমিই সুরাইয়াকে অনুরোধ করেছিলাম। সুরাইয়া প্রথমদিকে হাসানের সঙ্গে নিজেকে আবেগী-সম্পর্কে জড়াতে রাজি হয়নি। পরে, ফেনী ব্রাউন ও কীটস-এর সম্পর্কের কথা বিবেচনায় গ্রহণ করে সুরাইয়া হাসানের সঙ্গে নিজেকে জড়াতে রাজি হয়। কিন্তু আমি একটু আশ্চর্য হয়েই লক্ষ্য করি যে, কিছুদিনের মধ্যেই সুরাইয়া হাসানকে তাঁর প্রেমের একান্ত শিকারে পরিণত করে, আমার কাছ থেকে ক্রমশ আপন গোপন গুহার ভিতরে হাসানকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। যেন আমি ওদের প্রেমের পথের কাঁটা। মনে হয় সুরাইয়াকে তুষ্ট করার জন্য, আবুল হাসানও আমার প্রতি একধরনের উদাসীনতা প্রদর্শন করে চলেছে। এ নিয়ে অবশ্য আমার মনে কোনো ক্ষোভ ছিল না। আমি ভাবছিলাম, হাসান যদি এই প্রেমে সুখী হয়, তবে তাই হোক। ঐ সময়টাকে রূপসী ও রহস্যময়ী মৈত্রেয়ীর প্রেমে নিমগ্ন না থাকলে, নব-প্রেমিকযুগলের এই উদাসীনতা আমাকে হয়তোবা আরও বেশি কষ্ট দিতে পারতো।

[শিল্পী মৈত্রেয়ী রায় তাঁর পিতা, মনস্বী লেখক প্রফেসর শিবনারায়ণ রায়ের সঙ্গে ১৯৭৫ সালের শুরুর দিকে অস্ট্রেলিয়া থেকে ঢাকায় বেড়াতে এসেছিল। শ্রী রায় প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসানের আমন্ত্রণে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং প্রফেসর হিসাবে ঢাকায় এসেছিলেন। মৈত্রেয়ী ছিল, শুধু তখন পর্যন্ত নয় এখনও পর্যন্ত, আমার দেখা রমণীদের মধ্যে সবচেয়ে রূপসী। তখন ওর মতো রূপসী-বিদূষী ও বিদেশিনীর প্রেমে পড়া থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারাটা ছিল সকল কবির জন্যই খুব কঠিন ব্যাপার। হাসান তখন চিকিৎসার্থে পূর্ব-বার্লিনে। ঢাকায় থাকার কারণে, অন্য অনেকের মতো আমি মনে-মনে রূপসী মৈত্রেয়ীর প্রেমে পড়ি। তারপর প্রচলিত নিয়ম মাফিক, মৈত্রেয়ীর প্রেম অর্জনের জন্য আরও কয়েকজন প্রেমার্থীর সঙ্গে আমি দ্বন্দ্বে লিপ্ত হই। অন্য কেউ লেখার আগেই আমি মৈত্রেয়ীকে নিয়ে 'পিপীলিকা' কবিতাটি লিখে ফেলি এবং শাহজাদপুরে রবীন্দ্রস্মৃতিপীঠ পরিদর্শনে যাবার পথে যমুনাবক্ষে ওকে ঐ কবিতাটি পাঠ করে শোনাই। ও বাংলা ভালো জানতো না। পরিবারের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ায় সে বড় হয়েছে। ভালো ইংরেজি জানে। ইংরেজিতে লেখালেখিও করে। তখন আমার বাংলা কবিতাটি মেয়েকে ইংরেজিতে তর্জমা করে বুঝিয়ে দিতে, ওর বাবা-মা আমাকে সাহায্য করেন। তাতে আমার খুবই উপকার হয়। কবিতাটি মৈত্রেয়ীর মনকে স্পর্শ করতে সক্ষম হয়। করুণাময়ী মৈত্রেয়ী, তখন ব্যাপারটা বুঝতে পারে এবং ওর উদ্দেশ্যে ধাবিত আমার ভালোবাসাকে অবিশ্বাস্য-প্রশ্রয় দান করে আমাকে চিরঋণী করে।

কিছুদিনের মধ্যেই, আমাকে প্রথমে প্রেমে ডুবিয়ে ও পরে বিরহে নিক্ষেপ করে, সে তার পিতা-মাতার সঙ্গে বাংলাদেশ ত্যাগ করে, ইউরোপ হয়ে অস্ট্রেলিয়ায় ফিরে যায়। যাবার পথে, রোম থেকে সে আমাকে শেলী ও কীটস-এর কবর থেকে তোলা রক্তলাল গোলাপের দুটো পাপড়ি ওর চিঠির ভাঁজের ভিতরে পুরে পাঠায়। আমি তখন দিবানিশি জেগে,

মৈত্রেয়ীকে নিয়ে একটি প্রায় পুরো কাব্যগ্রন্থ বৈচিত্রের ভালোবাসা : প্রকাশকাল: জুন ১৯৭৫] রচনা করি।

কিছুটা রাজনৈতিক ও কিছুটা মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার কারণেই সুরাইয়া আমাকে এবং আমি সুরাইয়াকে অপছন্দ করতে শুরু করি। সুরাইয়া হাসানকে সত্যি-সত্যিই ভালোবাসে কি-না, এ নিয়েও আমার মনে সন্দেহ কাজ করতে থাকে। হাসান ছাড়াও, কবিতার জগতের বাইরের অপরিচিত পুরুষদের সঙ্গে সুরাইয়াকে আমি প্রায়ই দেখতাম। আমার সন্দেহ হতো, কি জানি। সুরাইয়া আবার সিআইএ-র সঙ্গে যুক্ত নয়তো? শুধু সুরাইয়া নয়, বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার পর, আমি মৈত্রেয়ীকেও সিআইএ-র সঙ্গে যুক্ত বলে মনে-মনে সন্দেহ করতাম। তবে ঐ সন্দেহটা খুব একটা জোরালো ছিল না। সুরাইয়ার সঙ্গে সেনাবাহিনীর কোনো- কোনো অফিসারের ওঠা-বসা ছিল বলে, সুরাইয়া সম্পর্কে ঐ সন্দেহটা ছিল খুবই জোরালো। আমি সুরাইয়াকে কিছুটা ভয়ও পেতাম। ওর এক ভাই তখন সেনাবাহিনীতে ছিল বলে শুনেছিলাম।

হাসানের কারণে সুরাইয়া আমাকে মুখ ফুটে 'আপনি হাসানের কাছে আসবেন না'— কথাটা বলতে পারতো না। কিন্তু এমনটিই সে মনে-মনে চাইতো। সুরাইয়া আমাকে একটু ঘুরিয়ে অন্যভাবে বলতো, "আপনি ওর কাছে বেশি আসবেন না। আপনি আসলে ও একটু ইমোশনাল হয়ে যায়। তাতে ওর ক্ষতি হয়।' আমি সুরাইয়ার যুক্তিটা মানতাম না। বার্লিন থেকে ফেরার পর আমি জানতাম, হাসান খুব বেশিদিন বাঁচবে না। হাসানও তা জানতো। ফলে, মৃত্যুপথযাত্রী হাসানের শয্যাপাশে যতটা সম্ভব বসে থেকে তাঁকে সঙ্গ দেয়ারই চেষ্টা করতাম আমি। সুরাইয়া তা পছন্দ না করলেও হাসান, ওর মা এবং বোন বুড়ি আমাকে ধরে রাখতো। আমাকে কাছে পেলে হাসান সত্যিই একটু আবেগপ্রবণ হয়ে পড়তো।

খালেদের অভ্যুত্থানটি যে ব্যর্থ হয়েছে, তা গোপন করার মতো সামান্য ব্যাপার ছিল না। পিজির পাশেই রেডিও। হাসানের কাছে এতো বড় খবরটি গোপন থাকার কথা নয়। হাসান আমার মতো রাজনীতি- নিমগ্ন ছিল না, তবে আমার মনের দিকটা বিবেচনা করে সে আমার রাজনৈতিক উদ্বেগকে নিজের উদ্বেগে পরিণত করতো। আমি তা জানতাম। তাই অভ্যুত্থান ব্যর্থ হওয়ার কথাটি জানালেও, হাসানের কাছ থেকে আমি খালেদ মোশাররফের করুণ মৃত্যুর খবরটি গোপন করলাম তাছাড়া খালেদের নিহত হওয়ার খবরটি তখনও সমর্থিত ছিল না খালেদের সঙ্গে হাসানেরও পরিচয় ছিল।

হাসান ভাবলো, ১৫ আগস্টের শোক সামলে উঠতে না উঠতেই আমি যে আবার একটা আঘাত পেয়েছি, তাতে হয়তো আবার আমি গ্রামের বাড়িতে ফিরে যাবো। সেই ভয় থেকেই হাসান বললো, তুমি আবার গ্রামে ফিরে যাবে না তো! বুঝলাম, হাসান আমার মনের ভাবনা ঠিকই ধরতে পেরেছে। আমি এরকম ভাবছিলামও বটে। কিন্তু সেই ভাবনাটাকে মনের ভিতর বাড়তে না দিয়ে হাসানের পান্ডুর মুখের দিকে তাকিয়ে আমি বললাম, না, তুমি সুস্থ হয়ে না ওঠা পর্যন্ত আমি আর গ্রামে ফিরে যাবো না।

হাসান কি একটু আশার আলো দেখতে পেয়েছিল আমার কথা মধ্যে? হয়তো পেয়েছিল। তাই বললো, এবার আমিও তোমার গ্রামের বাড়িতে যাবো

হাসান আগে বেশ কয়েকবার আমাদের গ্রামের বাড়িতে গেছে। আমাদের পরিবারের সকলের সঙ্গেই ওর মধুর সম্পর্ক। গ্রাম থেকে ফিরে আসার পর হাসান অভিমানি কণ্ঠে বলেছিল, 'তোমার মতোই আমিও ভাবছি আমার গ্রামের বাড়িতে ফিরে যাবো। ঢাকা আমার আর ভালো লাগছে না। গ্রামের বাড়িতে ফিরে গিয়ে পুকুরের পাড়ে একটি ছোট্ট কুঁড়েঘর বানিয়ে তার মধ্যে আমি থাকবো একা। কবিতা লিখবো। মা থাকবে, বোন থাকবে।...' তাঁর পাশে কোনো প্রেমিকার কথা সে আর কেন জানি, ভাবতে পারছিল না। আমি বললাম, ঠিক আছে যাবে, আগে তো তুমি সেরে ওঠ।

হাসান বললো, তুমি তো এখনও মহাদেবের বাসাতেই থাকছো, তাই থাকো। ঐ মেসে আর ফিরে যেয়ো না। একদিন সময় করে নীলা বৌদিকে নিয়ে এসো। খুব দেখতে ইচ্ছে করে। বলবে রান্না করে কিছু নিয়ে আসতে। তীর্থ (মহাদেবের ছেলে তীর্থ তখন মাত্র এক

বছরের) ভালো আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ, ভালো আছে। আমি উঠে যাচ্ছিলাম। হাসান আমাকে নীলার কথা আবার স্মরণ করিয়ে দিলো।

রাতে বাসায় ফিরে গিয়ে আমি আর মহাদেব রেডিও নিয়ে বসলাম খবর শোনার জন্য এভাবেই আমাদের সময় কাটে। বিভিন্ন রেডিওর খবর শুনি এবং প্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করি। তখন আমাদের নাওয়া-খাওয়ার কোনো ঠিক নেই। নানা রকমের দুশ্চিন্তার মধ্যে আমাদের সময় যে কীভাবে কেটে যায়, তা বুঝতেই পারতাম না। আজিমপুরে আমাদের পাশের গলিতেই থাকতেন আবুল মঞ্জুর। তিনি তখন খুব সম্ভবত বিগ্রেডিয়ার ছিলেন। গভীর রাতে কার্ফুর মধ্যে গলির ভিতরে তাঁর গাড়ি আসতো। আমরা ভয়ে ভয়ে থাকতাম, এই বুঝি সেনাবাহিনীর জীপ এলো আমাদের তুলে নিয়ে যেতে। পরে জেনেছিলাম, গভীর রাতে মঞ্জুর বাসায় ফেরেন। তাতে আমাদের ভয় কিছুটা কাটে। হাজার হলেও তিনি আমাদের পাড়ার মানুষ। বিপদে আপদে তাঁর সাহায্য পাওয়া যাবে।

শেষ পর্যন্ত তাহেরের নেতৃত্ব কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়, তা দেখার জন্য কিছুটা উদগ্রীব ছিলাম। দুপুরে রেডিও অফিসে গিয়ে শুনে এসেছিলাম, মোশতাককে তিনি জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে দেননি। শুনেছিলাম, তাহের তাকে পায়খানার মধ্যে আটকে রেখেছিলেন। কিন্তু রাতে যখন জিয়ার পর তিনিও জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন, তখন বুঝলাম এই যুদ্ধে তাহেরও হেরে গেছেন। তাঁর সিপাহী বিপ্লবটিও ব্যর্থ হয়েছে। তাই ব্যক্তিগতভাবে কর্নেল তাহেরের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানালেও, জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে জিয়া তাহেরের নাম একবারের জন্যও উল্লেখ করেননি। জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ভাষণে জিয়া বলেন :

'প্রিয় দেশবাসী, আসসালামু আলাইকুম।

আমি মেজর জেনারেল জিয়া বলছি : বর্তমান পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের জনগণ, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী, বিডিআর, পুলিশ, আনসার এবং অন্যান্যদের অনুরোধে আমাকে সাময়িকভাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের চীফ মার্শাল ল এডমিনিস্ট্রেটর ও সেনাবাহিনী প্রধান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হয়েছে। এ দায়িত্ব ইনশাআল্লাহ আমি সুষ্ঠুভাবে পালন করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করবো। আপনারা সকলে শান্তিপূর্ণভাবে যথাস্থানে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করুন। দেশের সর্বস্থানে, অফিস-আদালত, যানবাহন, বিমান বন্দর, নৌবন্দর ও কলকারখানাগুলি পূর্ণভাবে চালু থাকবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। খোদা হাফেজ। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।'

(সূত্র : দৈনিক বাংলা ৮ নভেম্বর ১৯৭৫)।

জিয়ার ভাষণের পর-পরই খালেদের হাতে ক্ষমতা হারানো খন্দকার মোশতাকও জাতির উদ্দেশ্যে একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ প্রদান করেন। তিনি অত্যন্ত কৌশলের সঙ্গে তাঁর ভাষণে ৩ তারিখের জেল-হত্যার দায় এড়াবার উদ্দেশ্যে তাঁর সরকারকে '১৫ আগস্ট থেকে ২ নভেম্বর পর্যন্ত বিদ্যমান সরকার' বলে অভিহিত করেন। তাঁর অন্তিম ভাষণে তিনি জেনারেল ওসমানীর ভূমিকাকে মূল্যায়ন করেন এভাবে : 'আমার প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা এম এ জি ওসমানীর সংকটকালীন এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পরিসমাপ্ত হয়েছে। দৃঢ় চরিত্রের অধিকারী এই কর্মবীর যা করেছেন তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।'

খালেদ মোশাররফ কর্তৃক মনোনীত রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাদাত মুহম্মদ সায়েম আগের দিন রাতে (৬ নভেম্বর) জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছিলেন

৬ নভেম্বর রাষ্ট্রপতি সায়েম জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে বলেছিলেন :

'গত ১৫ আগস্ট কতিপয় অবসরপ্রাপ্ত এবং চাকুরিরত সামরিক অফিসার এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ও তাঁর পরিবার পরিজনকে হত্যা করে। জনাব খন্দকার মোশতাক আহমদ রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করে সামরিক আইন জারী করেন। প্রকৃতপক্ষে এই ঘটনার সঙ্গে সামরিক বাহিনী সংশ্লিষ্ট ছিলো না।'

(সূত্র : দৈনিক বাংলা : ৮ নভেম্বর ১৯৭৫)

খালেদের অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়ে যাবার পর, মনে হয়েছিলো স্বাভাবিকভাবেই অতঃপর তিনি ক্ষমতা ছেড়ে দেবেন। জিয়া তাঁকে আর রাখবেন না। আর জিয়া যদি তাঁকে রাখতেও চান, তিনিই থাকতে চাইবেন না। কিন্তু, তিনি অপরিবর্তিত থেকে গেলেন। মাত্র ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে, ভোল পাল্টিয়ে, তিনি আবার বেতার-টিভির সামনে এসে উপস্থিত হলেন জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে। আমরা অত্যন্ত কৌতূহল নিয়ে তাঁর কৌতুকময় দ্বিতীয় ভাষণটি শুনলাম। আগের দিন খালেদের জোরে তিনি যে-প্রেসিডেন্টকে হটিয়ে দিয়ে ক্ষমতায় এসেছিলেন, পরদিন ক্ষমতায় থাকতে দেয়ার কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে তিনি সেই ক্ষমতাচ্যুত খুনি প্রেসিডেন্ট খোন্দকার মোশতাকের ভূয়সী প্রশংসা করে যে ভাষণটি প্রদান করেন, তা ছিল নিম্নরূপ :

'বিসমিল্লাহের রাহমানের রাহীম। প্রিয় দেশবাসী ভাই ও বোনেরা, আসসালামু আলাইকুম।'

'গতরাতে আপনাদের উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে কি পরিস্থিতিতে আমার প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হয়েছে—তার কিছুটা আভাস দিয়েছি। প্রেসিডেন্ট পদে খোন্দকার মোশতাক আহমদের পুনর্বহাল হওয়ার পক্ষে স্বতঃস্ফূর্ত দাবী সত্ত্বেও তাঁরই অনুরোধক্রমে আমি প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার চালিয়ে যেতে সম্মত হয়েছি। খোন্দকার মোশতাক আহমদের দেশব্যাপী জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও তিনি ক্ষমতা হস্তান্তরের যে মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন, তা যে কোনো উন্নয়নশীল দেশে বিরল এবং সেই দেশের জনগণের জন্য গর্বের বিষয় .....

(সূত্র : দৈনিক বাংলা : ৮ নভেম্বর ১৯৭৫)

খালেদ মোশাররফের অভ্যুত্থানটি কি তবে ব্যর্থ হলো? তাঁর আত্মদান বিফলে গেল? বাংলাদেশের রাজনীতিতে এর কি কোনো সদর্থক ভূমিকা ছিল না? আমি বলবো, না ব্যর্থ হয়নি। খালেদ মোশাররফ তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন।

১ খোন্দকার মোশতাক আহমদ ও তাঁর তথাকথিত 'সূর্যসন্তানদের ক্ষমতাচ্যুত করে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকান্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িতদের (আত্মস্বীকৃত খুনিদের) দ্বারা শাসিত হওয়ার গ্লানির হাত থেকে তিনি আমাদের বাঁচিয়েছিলেন।

[পরবর্তিকালে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকান্ডের সঙ্গে পরোক্ষভাবে জড়িতদের দ্বারা শাসিত হওয়াটা তুলনামূলকভাবে ভালো ছিল কিনা—তা অবশ্য ভিন্ন বিচার্য বিষয়।]

২ তিনি জেল-হত্যার বিচারের লক্ষ্যে বিচারপতি আহসানউদ্দিন চৌধুরী ও বিচারপতি কে এম সোবহান-এর নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করেছিলেন। কারা, কীভাবে জেলের ভিতরে চার জাতীয় নেতাকে হত্যা করেছে—তা তদন্ত করার পাশাপাশি, ৩ তারিখের সন্ধ্যায় কী পরিস্থিতিতে দুষ্কৃতকারীদের দেশত্যাগ করতে দেয়া হয়েছে–তাও ঐ তদন্ত কমিশনের বিচার্য হিসেবে গৃহীত হয়েছিল।

৩ ১৫ আগস্টে বর্বর হত্যাকান্ডের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সরকারকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্রের সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আমাদের সামরিক বাহিনী যে যুক্ত ছিল না, এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণাটি তিনি তাঁর নিযুক্ত রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সায়েমের মাধ্যমে জাতি ও বিশ্বকে অবহিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

প্রকৃতপ্রস্তাবে, প্রথমে জাতির জনককে সপরিবারে ও পরে জেলের ভিতরে বন্দি চার জাতীয় নেতাকে হত্যা করার কলংকের হাত থেকে সেদিনই আমাদের সেনাবাহিনী মুক্তি লাভ করেছিলো। এটা ছিল খালেদের একটা খুবই বড় কৃতিত্ব।

আমার লেখাটি এখানেই শেষ হতে পারতো। কিন্তু পারলো না। পারলো না এই জন্য যে, আমি লেখার শুরুতেই বলেছিলাম, নভেম্বর মাসটি ব্যক্তিগতভাবে আমার জন্য ছিল আরও বেশি ঘটনাবহুল। ঐ মাসটি আমার কাছে কেন বেশি ঘটনাবহুল ছিল, তা বলার জন্যই আমাকে আরও কয়েক পাতা লিখতে হচ্ছে।

৮ নভেম্বর তারিখে আমরা জানতে পারি, ৭ নভেম্বরের সকালে বিপ্লবী সিপাহীরা ঢাকা টেলিভিশনের ভিতরে ঢুকে টিভির কর্মাধ্যক্ষ জনাব মনিরুল আলম, প্রধান হিসাবরক্ষক জনাব

আকমল হোসেন ও টিভির প্রশাসনিক কর্মকর্তা জনাব সিদ্দিক সাহেবকে গ্রেফতার করে; পরে ঐ গ্রেফতারের প্রতিবাদ করতে গিয়ে আলোকচিত্রগ্রাহক ফিরোজ চৌধুরীও সেনাবাহিনীর হাতে গ্রেফতার হন। সারাদিন তাঁদের টিভিতে আটক রাখার পর সন্ধ্যার দিকে, চোখ বেঁধে তাঁদের অজানা স্থানের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর থেকে তাঁদের আর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। ভারতের দালাল হিসেবেই তাঁদের চিহ্নিত করা হয়েছিল বলে লোকমুখে শুনতে পাই। তাঁরা নিহত হয়েছেন বলেই তখন খবর রটে।

উন্মত্ত সিপাইরা সেনাবাহিনীকে অফিসার মুক্ত করার নামে বেশ কিছু সংখ্যক সামরিক অফিসারকেও গুলি করে হত্যা করেছে বলে খবর পাওয়া যায়। ঐসব রোমহর্ষক সংবাদ শোনার পর সিপাহী বিপ্লবের ভয়ে আমার ও মহাদেবের হৃৎকম্প বেড়ে যায়। আকমল সাহেবের স্ত্রীর সঙ্গে আমার খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। তিনি ছিলেন আমাদের দেশের প্রথম মহিলা ইঞ্জিনিয়ারদের একজন। মাত্র কিছুদিন হয় বিয়ে হয়েছিল তাদের। ওদের দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে আমার খুব কষ্ট হতে থাকে; কিন্তু মুখ বুজে কষ্টকে বুকের মধ্যে বহন করা ছাড়া তখন আমার আর কিছুই করার থাকে না। আমার ঘুম আসে না। অজস্র চিন্তা এসে মাথায় ভিড় করে। আমি আমার চারপাশে আততায়ীর তপ্ত নিঃশ্বাস শুনতে পাই প্রিয়জনদের সঙ্গে সঙ্গে আমিও মনে-মনে নিহত হতে থাকি

হাসানের অবস্থা ভালো নয়। শ্বাস নিতে খুবই কষ্ট হচ্ছে। হৃৎপিণ্ডের নষ্ট হয়ে যাওয়া বাল্ব দুটো ক্রমশ আরও খারাপ হতে চলেছে। শীত পরাতে শ্বাসকষ্টের সঙ্গে কাশিটাও এসে যুক্ত হয়েছে। সুরাইয়া আমাকে জানালো, এখন কাশির সঙ্গে একটু-একটু রক্তও যাচ্ছে। ডাক্তাররা খুব একটা আশা দিতে পারছেন না। তবু পিজির ডাক্তাররা চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছেন যথাসাধ্য। আমরা সকাল বিকাল হাসানের কাছে যাচ্ছি। ওকে সঙ্গ দিয়ে যতটা সম্ভব অসুখের যাতনা ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করছি। ওর শয্যাপাশে বন্ধুবান্ধব আর অনুরাগীর ভিড় লেগে আছে। সন্ধানী প্রকাশনী থেকে হাসানের নতুন কবিতার বই 'পৃথক পালংক' বেরিয়েছে। লাইনোতে ছাপা। কাইয়ুম চৌধুরীর আঁকা চমৎকার বাইকালার প্রচ্ছদ। প্রচ্ছদে একটি পুরনো দিনের পালংকের ছবি। চার ফর্মার কবিতার বইটি হাতে নিয়ে হাসান সারাক্ষণ নাড়াচাড়া করছে। বারবার পড়ছে কবিতাগুলো। এ বইয়ের অধিকাংশ কবিতাই অসুখ আর মৃত্যুর বিষাদময়তা দিয়ে মোড়া। আগের দুটো কাব্যগ্রন্থের তুলনায় এই বইয়ের কবিতাগুলো ভিন্নস্বাদের হয়েছে। হাসান বইটি কোনো মন্তব্য ছাড়াই উৎসর্গ করেছে ওর কবি-বান্ধবী সুরাইয়া খানমকে। আমি হাসানের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছি। এবং এ বইয়ের কবিতাগুলো যে খুবই ভালো হয়েছে, তা বলেছি। হাসান আমার প্রশংসা শুনে খুশি হয়েছে। হাসান ওর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'যে তুমি হরণ করো' আমাকে উৎসর্গ করেছিল। আমি আমার প্রথম বইয়ে হাসানকে একটি কবিতা উৎসর্গ করেছিলাম। কিন্তু কোনো বই উৎসর্গ করা হয়নি। হাসানকে বললাম, আমি আমার পরের বইটি তোমাকে উৎসর্গ করবো। বইটির কিছু কবিতা লেখা হয়ে গেছে আগামী ফেব্রুয়ারির মধ্যে বাকি কবিতাগুলো লিখে ফেলবো। হাসান বললো, তোমার 'চৈত্রের ভালোবাসা' বইটা আমাকে দিতে পারতে। আমি লজ্জা পেলাম। বললাম, তোমার এই বইটির মতোই ওই বইটা ছিল মৈত্রেয়ীকে নিয়ে লেখা, কিছু কবিতা ছিল পূরবীকে নিয়ে। তাই ওটা তোমাকে দিইনি। এবার আর মিস হবে না। হাসান হাসলো। আমি বুঝতে পারলাম, ঐ হাসির স্বস্তি এবং আনন্দের চাইতে অভিমানের পরিমাণটাই বেশি ছিল। কিন্তু আমার তখন কিছুই করার ছিল না। আমি যে ইতোমধ্যেই বিলম্ব করে ফেলেছি, তা তখন কেমন করে বুঝাবো। হাসান যে আমাকে ঢাকায় ফিরে আসার আহ্বান জানিয়ে নিজে অসুস্থ হয়ে পড়বে এবং তাঁর জীবন সংশয় দেখা দেবে—তা আমি কেমন করে জানবো?

৫

আজ ১১ নভেম্বর। সকালের দিকে বাসা থেকে বেরিয়েছি। রয়েলটির টাকা উদ্ধার করার জন্য বাংলাবাজারে প্রকাশকদের কাছে যাবো। হাতে টাকা নেই একেবারে। ঢাকায় আসার পর থেকে মহাদেবের ওপর খাচ্ছি। 'পূর্বদেশ' (অবজারভার হাউস থেকে প্রকাশিত বাংলা দৈনিক) বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে মহাদেবও প্রায় বেকার। বাকশাল গঠনের পর সরকারী সিদ্ধান্তে চারটি কাগজ রেখে বাকি সব কাগজ বন্ধ হয়ে যাবার কারণে, তখন পূর্বদেশও বন্ধ হয়ে যায়। বন্ধ হয়ে যাওয়া কাগজের সাংবাদিকরা তখন তাদের মোট বেতনের একটা অংশমাত্র পায়। পুরোটা পায় না। বন্ধ হয়ে যাওয়া কাগজের অনেক সাংবাদিককে তখন সরকারী চাকরি দেয়া হয়েছিল। মহাদেব সরকারী চাকরি নেয়নি। ফলে তাকে বেশ অর্থকষ্টের মধ্যেই দিনাতিপাত করতে হচ্ছিল। বাংলাবাজারে আমার বইয়ের প্রকাশকদের কাছে যাবার সময় ভাবলাম, কিছু টাকা দিয়ে যদি মহাদেবকে সাহায্য করা যায় তো ভালো হবে। হাসানের জন্যও কিছু ফল-টল কিনে নিয়ে যেতে পারবো।

সারাদিন বাংলাবাজারে কাটিয়ে, বিউটি বোর্ডিং-এ দুপুরের খাওয়া সেরে পড়ন্ত বিকেলের দিকে আমি বাংলাবাজার থেকে পিজির উদ্দেশ্যে ফিরে আসি। নীলাকে যে পিজিতে নিয়ে যাবো বলে বসিয়ে রেখে এসেছিলাম, তা আমার একদম মনেই ছিল না। এই লেখাটি লিখতে শুরু করার পর, সম্প্রতি নীলা আমাকে এ-সত্যটি জানিয়েছে। শুনে আমারও মনে পড়লো।

রিকশায় করেই আমি পিজির গেইটে আসি। রিকশা থেকে নেমে ভিতরে ঢুকতে যাবো এমন সময় আমার চোখে পড়লো— রিসেপশনের সামনের ছাদের নিচে একদল মিলিটারি অপেক্ষা করছে। দূর থেকে মিলিটারি জিপ দেখলেই ভয়ে আমার বুক কাঁপে। এখন দেখছি একেবারে আমার চোখের সামনে। অপেক্ষমাণ। কে জানে কার জন্য অপেক্ষা করছে এই মিলিটারি জিপ? আমার জন্য নয় তো? আমার ভয়টাই আজ সত্য হবে না তো! জলপাই রঙের জিপটি রয়েছে সামনে। তার পেছনেই একটি জলপাই রঙের বড় পিকআপ ভ্যান। জিপে একজন সামরিক অফিসার বসে আছেন, তার পাশে একজন ড্রাইভার। পিক-আপটিতে দশ বারোজন সশস্ত্র জোয়ানের একটি দল। তাদের ভাবসাব দেখে মনে হয় তারা কারও জন্য অপেক্ষায় আছে। হাসপাতালে ঢুকতে গেলে ওদের সামনে দিয়েই আমাকে যেতে হবে। তাই আপাতত হাসপাতালে না-ঢোকার সিদ্ধান্ত নিয়ে আমি গেট-সংলগ্ন নাহিদ স্টোর- এর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমি যে ভয় পেয়ে গেছি, মিলিটারিদের দেখে, তা যথাসম্ভব গোপন করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকি। আমি মিলিটারিদের দিকে পেছন দিয়ে নাহিদ স্টোর থেকে এক খিলি পান নিই। ইচ্ছা করেই বিলম্ব করতে থাকি, যাতে এর মধ্যে মিলিটারিরা চলে যায়। আমি তাদের চলে যাবার জন্য সময় দিই। পান মুখে পুরে কিছুক্ষণ পর একটু কালো জরদা চাই। পানের বোঁটা হাতে নিয়ে আমি চুনের সন্ধান করি। পকেটে খুচরো পয়সা থাকার পরও আমি একটি পাঁচ টাকার নোট বাড়িয়ে ধরি দোকানীর উদ্দেশ্যে। তাতে বেশ কিছু সময় কাটানো সম্ভব হয়। শুধু এক খিলি পান খাবার জন্য আমি যে এতোটা সময় নিচ্ছিলাম সেজন্য দোকানীটি যে খুব বিরক্ত হচ্ছিল আমার ওপর, তা আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম। কিন্তু আমি কেন ওরকম করছিলাম, ঐ দোকানীটি তা বুঝতে পারলো কিছুক্ষণ পর; যখন মিলিটারিরা তাদের অফিসারের নির্দেশমতো পিক-আপ থেকে নেমে আমাকে পেছন থেকে ঘিরে ফেললো। আমি দোকানীর হঠাৎ ভড়কে যাওয়া বিকৃত চেহারা দেখেই বুঝতে পারলাম, আমাকে চারপাশ থেকে মিলিটারিরা ঘিরে ফেলেছে। তখন পাঁচ টাকার অবশিষ্টটা ফেরত দেয়ার উদ্দেশ্যে আমার দিকে প্রসারিত দোকানীর হাতটি ভয়ে ফ্রিজ হয়ে যায়। আমার পক্ষেও হাত বাড়িয়ে অবশিষ্ট টাকাটা আর ফেরত নেয়া হয়ে ওঠে না। সামরিক অফিসারের স্টিকের গুঁতো খেয়ে আমি ত্বরিৎগতিতে তার দিকে এমনভাবে ফিরে দাঁড়াই, যেন এতক্ষণ আমি এসবের কিছুই টের পাইনি। আমি যেন এই ভুবনের কেউ নই।

মিলিটারিদের এ্যাকশনের মধ্যে এমন একটি ভাব ফুটে ওঠে, যেন তাঁরা একজন খুব

দুর্ধর্ষ আসামিকে গ্রেফতার করতে চলেছেন। যেন এ- সময়ে আমি এখানে আসবো- এমন একটা পাকা ইনফরমেশন পেয়েই তারা এখানে এসেছিলেন। মনে হলো দীর্ঘ অপেক্ষার পর তারা তাদের প্রার্থিত আসামিটিকে খুঁজে পেয়েছে। এখন তাকে ধরবার পালা। আমি আমার চেহারার মধ্যে যতদূর সম্ভব নির্বিকার ভাবটি বজায় রাখার চেষ্টা করি। খুব বিনীত ভঙ্গিতে আমার বগলের নিচে চেপে ধরা বইয়ের প্যাকেটটি হতে নিতে চাই। তখন ঐ অফিসার আমার বইয়ের প্যাকেটটি ছিনিয়ে নেবার জন্য প্যাকেটটি ধরে আচমকা জোরে টান দেন। তাতে আমার প্যাকেটের ভিতর থেকে একটি বই মাটিতে পড়ে যায়। বইটির নাম —'প্রেমাংশুর রক্ত চাই'। আমি বইটি মাটি থেকে তুলতে গেলে- তিনি আমাকে বাধা দেন। তিনি নিজেই বইটি হাতে তুলে নিয়ে বইয়ের পাতা উল্টাতে থাকেন। তার আগে তিনি বইয়ের ছাপা আমার প্রতিকৃতিতে চোখ বোলান। বইয়ের প্রথম কবিতা 'হুলিয়া'র ওপর চোখ রেখে প্রশ্ন করেন, আমিই নির্মলেন্দু গুণ কি-না। আমি তাতে কিছুটা স্বস্তি বোধ করি; ভাবি, আমার পরিচয় জানার পর নিশ্চয়ই আমাকে ছেড়ে দেয়া হবে। তাই কিছুটা আনন্দের সঙ্গেই বলি, জ্বি আমিই। আমার বন্ধু কবি আবুল হাসান এই হাসপাতালে অসুস্থ, আমি তাঁকে দেখতে এসেছি ঐ অফিসারটি আমার বইটি নিজের দখলে নিয়ে নেন। তাতে আমি খুশি হই। মনে করি, তিনি হয়তো কবিতার ভক্ত। আমার কবিতার বইটি হয়তো তাঁর পছন্দ হয়ে থাকবে। ভাবি, বইটি সঙ্গে থাকাতে ভালোই হলো।

আমি যখন ভাবছি তিনি এখন আমাকে হাসপাতালে যাবার অনুমতি দেবেন, তখনই জিপে উঠতে-উঠতে তিনি আমাকে পেছনের জোয়ানদের পিক-আপটিতে ওঠার নির্দেশ দেন। আমি তখন খুবই ভয় পেয়ে যাই। জীবনাশংকায় আমার মুখ শুকিয়ে আসে। গত ক'দিন ধরে সিপাইদের অবস্থার যেসব খবর পেয়েছি, তাতে সিপাইদের সঙ্গে উঠতে আমার পা একেবারেই নড়ছিল না। বিশেষ করে ৭ নভেম্বরের টিভি-হত্যাকান্ডের ঘটনার কথা আমার মনে পড়ে। এবার কি তবে আমার পালা? ভগবান জানেন। আমাকে ঐ জোয়ানদের হাতে ছেড়ে দিয়ে অফিসারটি যদি অন্য কোথাও চলে যান, তাহলে ওরা কি আমার প্রতি সুবিচার করবে? ভারতের দালাল সন্দেহে ওদের হাতেই হয়তো আমার মৃত্যু হবে। আমি শেষবারের মতো ঐ অফিসারটিকে অনুরোধ করে বলি, প্লিজ আমাকে আপনার জিপে উঠতে দিন। তিনি আমার অনুরোধে কান না দিয়ে জিপে উঠেই তাঁর ড্রাইভারকে জিপ চালানোর নির্দেশ দেন। জিপটি চলতে শুরু করে। তখন পেছনের পিক-আপ ভ্যান থেকে নেমে আসা কয়েকজন জোয়ান, একটু আগে যাদের সঙ্গে উঠতে আমি আপত্তি জানিয়েছিলাম, আমাকে প্রায় চ্যাংদোলা করে তাদের গাড়িতে তুলে নেয়। পিক-আপে উঠে আমি একটি সীটের ওপর বসতে চেয়েছিলাম। তারা আমাকে নিচে বসবার জন্য বলে। আমি তাদের পায়ের নিচে লেটা দিয়ে বসি। তারা তাদের অস্ত্রগুলো আমার মাথা ও বুকের ওপর স্থাপন করে। আমি অসহায়ের মতো বাইরের দিকে তাকাই। লোকজন ঐ ঘটনাটি পথে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখছিলো। আমি পথের মধ্যে একটি পরিচিত মুখের সন্ধান করি, যাতে আমার মিলিটারির হাতে ধরা পড়ার খবরটি তাকে জানাতে পারি। কিন্তু না, কোনো চেনামুখই আমার চোখে পড়ে না। আমি তখন মৃত্যুর জন্য মনে মনে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকি। হাসান এবং মহাদেবের দিকে আমার খুব রাগ হতে থাকে। এদের চিঠি পেয়েই না আমি ঢাকায় ফিরে এসেছি। না হলে আমি তো আমার গ্রামেই থাকতাম। কী ভুলটাই না করলাম। অনুশোচনায় আমার বুক ভেঙে কান্না আসে।

আমাকে পিক-আপে উঠাতে কিছুটা বিলম্ব হয়েছিল, তাই অফিসারের জিপটি কোন্ পথে অগ্রসর হয়েছে তা জানার জন্য পিক- আপের জোয়ানরা শাহাবাগ-এর মরা-ঝর্নাটির কাছে দাঁড়িয়ে পথচারিদের সাহায্য নেয়। তখন পথচারিরা জানায় যে, ঐ জিপটি সোহরওয়ার্দী উদ্যানের ভিতরে পুলিশ কন্ট্রোল রুমের দিকে গেছে। জোয়ানরা তখন আমাকে নিয়ে পুলিশ কন্ট্রোল রুমের দিকে ছুটে যায়।

আমরা যখন ভিতরে প্রবেশ করি তখন সামরিক অফিসারটি কন্ট্রোলরুমে অবস্থানরত

পুলিশদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দান করে বেরিয়ে আসছিলেন। আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলার জন্য তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হই। তিনি ইঙ্গিতে তাঁর জোয়ানদের কী একটা নির্দেশ দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে যান। ভিতরে একজন পুলিশের এসপি বসেন। ঐ এসপিসহ বেশ ক'জন পুলিশ, জোয়ানদের হাত থেকে আমার চার্জ বুঝে নেবার জন্য এগিয়ে আসেন। পুলিশের হাতে আমাকে তুলে দিয়ে জোয়ানরাও তাদের পিক-আপে উঠে দ্রুত বেরিয়ে যায়।

আমি অসহায়ের মতো একা দাঁড়িয়ে থাকি। আমি বুঝতে পারি, আমাকে আপাতত পুলিশ কাস্টডিতে রেখে যাওয়া হচ্ছে। পরে আমাকে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাওয়া হবে। কন্ট্রোল রুমের পুলিশরা আমার প্রতি খুবই সদয় ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় শরিফের কেন্টিনে আড্ডা দিতেন, এমন দু'একজনকে সেখানেই পাই। তাঁরা সবাই আমাকে সাহস দেবার চেষ্টা করেন। বলেন, কবি সাহেব, আমাদের দিক থেকে আপনার কোনো ভয় নেই। আমরা আপনার কোনো ক্ষতি করবো না। আমরা আপনার সম্পর্কে কোনো অভিযোগ পাইনি। তবে, বুঝেন-ই তো। আমরা কিন্তু আপনাকে ছাড়তেও পারবো না। তারা কেন আপনাকে ধরেছে, তা তারাই ভালো জানে। আপনার জন্য আমরা চিন্তিত।

পুলিশদের সহানুভূতিমূলক আচরণ ও তাদের কথা থেকে আমি বুঝতে পারছিলাম আমার ভবিষ্যত-চিন্তায় ঐ পুলিশ অফিসাররাও চিন্তিত। তখন এসপি সালাম সাহেব আমাকে সাহস দেবার জন্য একটি পুলিশের খাতা খুলে আমাকে দেখান। তাতে দেখলাম, আমাকে যিনি আটক করেছেন তার নাম লেখা আছে। তার নাম কর্নেল নোয়াজেশ আহমদ। আমাকে অভয় দিয়ে এসপি সালাম সাহেব জানালেন, কর্নেল নোয়াজেশ সাহেব আমাকে পুলিশের হেফাজতে রেখে যাবার সময় লিখিতভাবে একটি নির্দেশ রেখে গেছেন পুলিশের জন্য— Dont misbehave with him. (উনার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবেন না।) ঐ কথাটি পুলিশের খাতায় লিখে দিয়ে তিনি ইংরেজিতে তাঁর নাম স্বাক্ষর করেছেন। আগে রাগ করলেও, ঐ নির্দেশটা লিখে দিয়ে যাবার জন্য কর্নেল নোয়াজেশের প্রতি আমি খুবই কৃতজ্ঞ বোধ করি। ভেবে পাই না, এমন নির্দেশই যদি রেখে যাবেন, তাহলে তিনি আমাকে গ্রেফতারই বা করলেন কেন? আমি যে বঙ্গবন্ধুর ভক্ত, আমি যে অভ্যুত্থানে খালেদ মোশাররফের সাফল্য কামনা করেছিলাম, তা তো তাঁর জানবার কথা নয়। সন্দেহবশত ধরলেনই যদি, তবে আবার আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার না করার জন্য পুলিশের প্রতি লিখিত নির্দেশ দেবার কারণ কি? এই নির্দেশের অর্থ কি এই যে, এই কবির সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে হলে আমি বা আমরা করবো, তোমরা পুলিশরা করো না? কী জানি! বিষয়টা আমার কাছে খুবই রহস্যজনক বলে মনে হতে থাকে। তিনি কি কারও কাছ থেকে আমার বিরুদ্ধে কোনো সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পেয়েছিলেন?

পুলিশ আমাকে অভয় দিলেও আমি তাদের সম্পূর্ণভাবে আস্থায় নিলাম না। আমি প্রথম সুযোগেই পায়খানায় যাবার নাম করে, পায়খানার ভিতরে ঢুকে আমার বুক পকেটে রাখা দুটো চিঠি বের করলাম। একটি চিঠি ছিল আমার ভারতবাসী বড় ভাইয়ের লেখা। বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আমার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি ঐ চিঠিটি লিখেছিলেন। অন্যটি আমেরিকা থেকে লিখেছিলেন পূরবী বসু। ঐ পত্রেও ছিল আমার জন্য উদ্বেগ। মহাদেবের বাসার ঠিকানায় চিঠি দুটো এসেছিল। আমি ভাবলাম, দেহ তল্লাসি করে ঐ চিঠি দুটো পেলে আবার সমস্যা হতে পারে। তাই ঐ চিঠি দুটো আমি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে টয়লেটের মধ্যে ফ্ল্যাশ করে দিলাম।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। আলো জ্বলে উঠেছে শহরে। ঐসব জ্বলে-ওঠা আলোর দিকে তাকিয়ে আমি ভাবি, আমার জীবনের আলো নিভতে না জানি আর কতক্ষণ বাকি! এসপি সালাম সাহেব আমাকে কন্ট্রোল রুম থেকে রমনা থানায় হস্তান্তর করার জন্য রমনা থানার ওসিকে একটি গাড়ি ও কিছু পুলিশ পাঠানোর জন্য ওয়ারলেসে ম্যাসেজ পাঠালেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই রমনা থানা থেকে এক গাড়ি পুলিশ চলে এলো। সোহরওয়ার্দী উদ্যানের পুলিশ-কর্মকর্তারা আমাকে ব্যথিত মনেই বিদায় জানালেন। গাড়িতে উঠবার সময় আমার

কানের কাছে এসে একজন বললেন, এই রাতটা যদি ভালোয় ভালোয় কেটে যায় তো বাঁচলেন। আচ্ছা, আপনাকে সাহায্য করতে পারেন, এমন কেউ কি আছেন, আর্মিতে? আমার তখন আবার খালেদের কথাই মনে পড়লো। বললাম, না ভাই, যিনি ছিলেন তিনি নিহত হয়েছেন। একবার জেনারেল সি.আর দত্তর কথাও মনে এসেছিল। কিন্তু তার নাম বলে, জানি, কোনো লাভ তো হবেই না বরং ঐ নামের কারণে আমার আরও বিপদ বাড়তে পারে।

আমি রমনা থানায় বেশ ক'জন পরিচিত পুলিশের দেখা পেলাম। আমি একসময় খুবই নিশাচর ছিলাম। তখন ঢাকার পথে তাদের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছিল। তারা আমাকে নিয়ে বেশ চিন্তার মধ্যে পড়লেন। রমনা থানার দারোগা সাহেব আমাকে সম্মান দেখিয়ে তাঁর পাশেই একটি চেয়ারে বসিয়ে রাখলেন। আমি ভাবলাম আর্মির সঙ্গে নিশ্চয়ই তাঁর কথা হবে একসময়। কর্নেল নোয়াজেশ নিশ্চয়ই আমার কথা ভুলে যাবেন না। তিনি একটা নির্দেশ অবশ্যই দেবেন। তখন হয় তিনি আমাকে ছেড়ে দেবেন, না হয় আমাকে চোখ বেঁধে পাঠিয়ে দেবেন ক্যান্টনমেন্টে এবং সেখানেই আমার বিচার হবে। চার জাতীয় নেতা এবং খালেদ মোশাররফ ও তাঁর সহযোগীদের মতো হয়তো গুলি করে, বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে হত্যা করা হবে আমাকেও। দারোগা সাহেব চাচ্ছিলেন যেন আমাকে আর্মি এসে নিয়ে যায়। তাহলে তিনি একটা উটকো ঝামেলা থেকে বাঁচেন। যখন তা হলো না, এবং হবার আশাও কম বলে মনে হলো— তখন রাত বারোটার দিকে তিনি আমাকে বললেন, কবি সাহেব, আপনাকে হাজতে ঢুকাবো না বলে ভেবেছিলাম কিন্তু আর তো অপেক্ষা করা যায় না। এবার একটু কষ্ট করে ওখানেই চলে যান। ওখানে একটু কষ্ট হবে, তবে আমি বলে দিচ্ছি, অন্য আসামিরা আপনাকে বিরক্ত করবে না।

দারোগা সাহেব আমাকে হাজতে ঢুকিয়ে অন্য আসামিদের কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তখন বেশ ক'জন আসামি সমস্বরে আমাকে স্বাগত জানিয়ে বললো, দাদাকে আমরা চিনি। উনি আমাদের গুরু। গুরু, আপনি এখানে কেন? ঐ সব আসামিদের সঙ্গে হাইকোর্ট প্রাঙ্গণে আমার পরিচয় হয়েছিল। ওরা মারফতী লাইনের সংসারত্যাগী মানুষ। হাইকোর্টে সিদ্ধি সেবন করে। আর মারফতী গান করে। ওদের পেয়ে আমার হাজতের ভয়টা একেবারেই কমে গেলো।

দারোগা সাহেবও খুশি হয়ে বিদায় নিলেন। কর্নেল নওয়াজেশ সাহেবের ঐ নির্দেশটির মূল্য আবারও টের পেলাম রমনা থানার দারোগা সাহেবের আচরণে। তিনি হয়তো ভয় পাচ্ছিলেন, হাজতের ভিতরে ধরা পড়া দাগী আসামিরা যদি আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে। হাজতের দাগী আসামীরা আমাকে সাদরে গ্রহণ করায় তিনি কিছুটা নিশ্চিন্ত মনে ঘরে ফিরতে পারলেন বলেই মনে হলো।

হাজতের ভিতরে ঢুকেই পরিচয় হলো কয়েকজন তরুণের সঙ্গে। এরা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। জাসদ ছাত্রলীগ করে। জাসদ আহুত ১৮ নভেম্বরের জনসভায় প্রচারকার্য চালানোর সময় বেবি ও মাইকসহ পুলিশ রাস্তা থেকে ওদের গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে এসেছে। ওরা কর্নেল তাহেরের ভক্ত ও অনুসারী। ওরা জিয়ার দিকে খুবই ক্ষিপ্ত ছিল। বললো, "জিয়াকে আমরা দেখে নেব। শালা বিশ্বাসঘাতক। আমরাই তাঁকে মুক্ত করেছি, আর এখন সে আমাদের জেলে পুরছে।'

'কী যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে কভু আশীবিষে দংশেনি যারে...' কবিতাটির কথা আমার মনে পড়লো। ভাবলাম, ভালোই হয়েছে। কর্নেল তাহের আর জেনারেল জিয়ার সমর্থকরা একসঙ্গে মিলতে পারলে বঙ্গবন্ধুর অনুসারীদের বিপদ আরও বাড়তো।

নোয়াজেশ-এর তাঁবুতেই যে খালেদের মৃত্যু হয়েছিল তা তখন আমি জানতাম না। ১১ তারিখেই জেনারেল জিয়াউর রহমান দ্বিতীয়বারের মতো জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদান করেন। তিনি তাঁর অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ভাষণে বলেন :

'আমি রাজনীতিবিদ নই। আমি একজন সৈনিক। কতিপয় মহলের বিভিন্ন প্রচারণার সঙ্গে

আমার নাম জড়িত দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। আমি পরিষ্কারভাবে বলে দিতে চাই যে রাজনীতির সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, এবং আমাদের সরকার সম্পূর্ণ নির্দলীয় ও অরাজনৈতিক।'

(জাসদের ডাকা ১৮ তারিখের জনসভায় কর্নেল তাহেরসহ জাসদ নেতাদের সঙ্গে জেনারেল জিয়াও ভাষণ দেবেন বলে তখন জাসদের পক্ষ থেকে প্রচার করা হচ্ছিল। রমনা থানায় আনীত জাসদ ছাত্রলীগের কর্মীদের ঐরূপ প্রচার চালানোর সময়ই রাস্তা থেকে গ্রেফতার করা হয়। সভাটি হওয়ার কথা ছিল বায়তুল মোকারমের প্রাঙ্গণে।)

১৪ আগস্ট পর্যন্ত আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর দূরবস্থা সম্পর্কে আপনারা অবগত আছেন। স্বাধীনতার পর ঐ দিন পর্যন্ত যে সরকার অধিষ্ঠিত ছিল সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি তাদের অবহেলার ফলে...।'

[সূত্র : দৈনিক বাংলা, ১৩ নভেম্বর ১৯৭৫]

এরকম একটি জীবন-মরণ সংকটের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলার জন্য নিজেকেই দায়ী বলে মনে হতে থাকে আমার। আমার মনে এরকম বিশ্বাস কাজ করতে থাকে যে, আজকের এই পরিস্থিতিটিকে আমিই ইনভাইট করেছি। এখন এর মূল্য তো আমাকে দিতেই হবে। আমার জন্য তখন ঘুম অবাস্তব কল্পনা। তবু হঠাৎ কি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আমি কিছুক্ষণের জন্য? কী জানি! একটু আগে তন্দ্রার ভিতরে আমি একটি স্বপ্ন দেখছিলাম। কে যেন আমাকে বলছে : ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডটি নিঃসন্দেহে খুবই বর্বর, খুবই নির্মম এবং নিষ্ঠুর একটি ঘটনা। পৃথিবীর ইতিহাসে এর কোনো তুলনা নেই। এমনকি পৃথিবীর কোনো কাব্যেও এরকম নিষ্ঠুরতার সন্ধান পাওয়া যাবে না। তাই বলে, কবি হলেই তুমি এমন বিশেষ কে যে, ঐ ঘটনার পর তোমাকে এতোটাই ভেঙ্গে পড়তে হবে; মানসিকভাবে এতোটাই বিপর্যস্ত হতে হবে; লোকজনকে জানান দিয়ে তোমার মন খারাপ ভাবটিকে প্রকাশ করতে হবে; ঢাকাকে আর 'বাসযোগ্য নয়' বলে প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে এই নগরী ত্যাগ করে গ্রামের বাড়িতে ফিরে যেতে হবে? বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে এতোটা প্রেম দেখানোর মতো কোনো বাস্তব যুক্তি তোমার জন্য কি ছিল? তাঁর সঙ্গে তুমি এমনকি ব্যক্তিগতভাবে পরিচিতও ছিলে না। আসলে, তুমি তাড়িত হয়েছিলে তোমার পোয়েটিক-ইগো দ্বারা। একটি বড়-রকমের ট্রাজিক ঘটনা যে ঘটে গেছে, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। অনেকেই তা স্বীকার করেন। প্রকাশ করার সুযোগ নেই বলে অনেকেই গোপনে ঐ ঘটনার বেদনা অনুভব করেছেন। কিন্তু তুমি অন্যদের মতো তোমার প্রতিক্রিয়া গোপন করতে চাওনি। শত্রুকে শাস্তি দেবার শক্তি তোমার ছিল না, যার ছিল সে অস্ত্র হাতে লড়তে ভারতে চলে গেছে। তুমি তো লড়তেও যাওনি। তোমার অস্ত্র হচ্ছে অভিমান। সেই অভিমানের অস্ত্রে নিজেকে উন্মাদে পরিণত করে, তুমি নিজেকে অন্যের চাইতে পৃথক প্রমাণ করার সুযোগ তৈরি করে নিয়েছো। এর সবটাই যে তোমার জ্ঞাতসারে ঘটেছে, তুমি পরিকল্পিতভাবে এগুলো করেছো, তা আমি বলবো না, তবে তুমি নিশ্চয়ই অস্বীকার করবে না যে, কল্পনায় এই ঘটনার সঙ্গে কোনো-না- কোনোভাবে নিজেকে তুমি জড়িত করে দেখতে চেয়েছিল। তোমার কবিস্বভাবের এই খুব ভেতরের গোপন-চাওয়াটাই তোমার পরবর্তি আচরণগুলোকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল। তাই গ্রামের বাড়ি থেকে ঢাকায় ফিরে এসেই তুমি যখন ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানের মুখে পড়লে, যখন তুমি এমন একটা ভাব প্রকাশ ও প্রচার করতে চেয়েছো যে, তোমার অনুমোদন নিয়েই খালেদ মোশাররফ তাঁর অভ্যুত্থানটি ঘটিয়েছেন। তুমিই তাঁর গাইড-ফিলোসফার।'

'তোমার বিগত কিছুদিনের আচরণের মধ্য দিয়ে যে সংঘাত ও সংকটকে তুমি আহ্বান করেছো, আজ সেই সংকট তোমার জীবনে প্রবেশ করেছে। কর্নেল নোয়াজেশ তোমাকে গ্রেফতার করেছেন, কথাটা যত না সত্য, তার বড় সত্য হলো, কর্নেল নোয়াজেশকে তুমি তোমার গোপন ইচ্ছাপূরণের ফাঁদে পা দিতে বাধ্য করেছো। এমন কিছু ঘটুক, তুমি কি তা চাওনি? চেয়েছো। চেয়েছো। কিন্তু এখন যখন ঘটনা ঘটে গেছে তখন ঘটনার ভয়াবহতা আঁচ করে ভয় পাচ্ছো। এখন ভয় পাচ্ছো কেন? যে বিপদকে মনে-মনে কামনা করেছিলে,

সে এসেছে, এখন তাকে বীরের মতো স্বাগত জানাও। তুমি যে বঙ্গবন্ধুর কথা বলো, তিনি তো তোমার মতো ভয় পাননি। তিনি তো যথার্থ বীরের মতো ফাঁসির দড়ি গলায় নিয়েও তাঁর বিশ্বাসের কথা বলেছেন। তাঁর ভালোবাসার কথা বলেছেন। তুমি ভয় পাও কেন? ভয় পেয়ো না, ওঠ, জাগো।'

স্বপ্নের ঘোর কেটে গেলে আমি দ্রুত উঠে বসলাম। বুঝতে পারলাম, আমি স্বপ্নমতো কিছু একটা দেখেছি। আমার গ্রামের শ্মশানবাসী জগা সাধুর শুভ্রশশ্মশ্রুমন্ডিত হাসিমাখা মুখখানি আমার মনের পর্দায় ভেসে উঠলো। তবে কি তিনিই এই কথাগুলো আমাকে বললেন? তখন আমার ভিতরে বিভ্রম কাজ করছিল না। আমি স্পষ্টই অনুভব করতে পারছিলাম, আমি আগের চাইতে সাহসী। কোথা থেকে আমি যেন সাহস খুঁজে পাচ্ছি।

দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার সময় লক্ষ্য করেছি, কোনো অপরাধ না থাকলেও, জন্মগতভাবে হিন্দু হওয়ার কারণেই আমি নিজেকে এক পর্যায়ে শাস্তিযোগ্য বলে ভাবতে শুরু করি। জন্মগতভাবে হিন্দু বা মুসলমান, শিখ বা খ্রিস্টান হওয়াটা যে আসলে কোনো অপরাধ নয়, হিংসার উন্মত্ততার ভিতরে পড়ে, তা আর তখন স্থির সত্য বলে আমার মনে হয় না। জীবন বাঁচানোর জন্মগত অধিকারবোধটি তখন ভিতর থেকেই কিছুটা শিথিল হয়ে পড়ে। ১৯৬৪-তে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলাকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে এসে আমি এরকম উপলব্ধি করেছিলাম। তারপর, ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার পটভূমিতে 'হিন্দু-শূন্য পাকিস্তান' গঠনের লক্ষ্যে পরিচালিত পাকবাহিনীর অঘোষিত শুদ্ধি অভিযানের ছত্রছায়ায়, আমাদের আশপাশের গ্রামের একদল লুটেরা-মুসলমান যখন নির্বিবাদে আমাদের বাড়িঘর লুট করছিল, তখনও আমি ঐরকমের উপলব্ধির শিকার হয়েছিলাম। এই উপলব্ধিটি এমনই মারাত্মক একটি ব্যাপার যে, তখন মানুষ একটি তুচ্ছাতিতুচ্ছ পতঙ্গে পরিণত হয়। সে তার সকল প্রতিরোধ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। প্রবল প্রতিপক্ষ তখন পতঙ্গ নিধনের মতো করেই দুর্বল প্রতিপক্ষকে নিধন করে। হত্যাকারীকেও মানুষ-হত্যার বিবেকী দায় তখন আর বইতে হয় না।

শুধু ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতিতেই নয়, বিশ্বাসগত রাজনৈতিক মত-পার্থক্যের কারণেও দেশে যখন ঐরকমের সংঘাতক্ষেত্র তৈরি হয়, তখনও বিজয়ী শক্তির হাতে পরাজিতরা কীটপতঙ্গবৎ নিহত হয়। ১৫ আগস্ট থেকে ৭ নভেম্বরের ঘটনাপুঞ্জ বিশ্লেষণ করে আমি এই ধারণায় উপনীত হলাম যে, জাতির জীবনে এখন সেরকম সময়ই উপস্থিত হয়েছে। আমি এখন আর কবি নির্মলেন্দু গুণ নই, আমি একজন কীট নির্মলেন্দু গুণ। আমি এখন একজন সামান্য পতঙ্গ। যাকে বুটের তলা দিয়ে মাড়িয়ে দিলেও কেউ, আহা! এটা কী করলেন, বলে সামান্য আক্ষেপটুকুও এখন আর প্রকাশ করবে না।

৩ নভেম্বরের ভোর থেকে ৬ নভেম্বরের মধ্যরাত পর্যন্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন থেকেও খালেদ মোশাররফ যে তাঁর প্রতিপক্ষকে মুহূর্তের জন্যও কীট-পতঙ্গের দৃষ্টিতে দেখেননি, এটি মানবিক দৃষ্টিকোণ বিচারে খুব বড়মাপের একটি বিষয় ছিল। ক্ষমতা দখলের দ্বন্দ্বে লিপ্ত হওয়ার পর, কোনো সামরিক অফিসার ইতোপূর্বে প্রতিপক্ষের সঙ্গে এমন মানবিক আচরণ করেছেন বলে মনে পড়ে না। এটি অবশ্যই খুব বড় একটি ঘটনা। হয়তো ঐ রকমের বড় মাপের একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে গিয়েই খালেদ ব্যর্থ হয়েছেন। যে দেশে ১৫ আগস্ট এবং ৩ নভেম্বরের জেল-হত্যার মতো নৃশংস ঘটনায় স্বাধীনতাযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী শক্তিটি ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে, সেই দেশে কোনো রক্তপাতহীন সামরিক অভিযানের পক্ষে জয়ী হওয়া কখনই সম্ভব ছিল না, এবং উচিতও নয়। খালেদ মোশাররফের মতো আপাত-ব্যর্থ একজন সমরনায়কের প্রাধান্য দিতে চাইবো। বলবো, ব্যাটা নিজে তো মরেছেই, আমাদেরকেও মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে গেছে। বলবো, কী দরকার ছিল ঐরকমের একটি ধরি মাছ না ছুঁই পানির মতো শান্তিবাদী-অভ্যুত্থান ঘটানোর?

একসময় খালেদকে নিয়ে আমি নিজেও এরকমই ভেবেছি। ভেবেছি, এই খালেদের জন্যই আজ আমার এই দুর্ভোগ। পরে মানুষের ঘুমিয়ে পড়ার কারণে রাত যখন খুব গভীর হয়ে আসে, যখন খুব ঘনঅন্ধকারে নিমজ্জিত হয় পৃথিবী, যখন এই মরপৃথিবীর কোনো-কোনো মানুষের চোখে আলো এসে পড়ে অনেক দূরের কোনো গ্রহ থেকে; -যখন আমার দেহ মৃত্যুকে গ্রহণ করার জন্য বীরের মতো প্রস্তুত হয়, তখন হঠাৎ মনে হয় যে-কোনো মূল্যে নিজ-জীবনকে রক্ষা করার চেয়েও জগৎ-সংসারে এমন কিছু বড় বিষয়ও আছে, যার কাছে জীবনের মতো একটি বড় জিনিসকেও খুবই তুচ্ছ বলে মনে হয়। তাইতো হাসি মুখে জীবনদানের ঘটনা পৃথিবীতে খুব একটা কম ঘটেনি। আমাদের দেশেও অমন ঘটনা অনেক ঘটেছে। আমি নিজে ভীতু বলেই খালেদকে দুষেছি। আত্মস্বার্থে আমার দৃষ্টি অন্ধ থাকার কারণে আমি তাঁর রক্তপাতহীন ব্যর্থ- অভ্যুত্থানে সৌন্দর্যকে দেখতে পাইনি।

সেদিন রমনা হাজতে পুরোপুরি না কাটালেও, আজ ২১ বছর পর ঐসব দিনের কথা লিখতে বসে অনুভব করছি, এখন আমার চোখের ছানি অনেকটাই কেটেছে। তাই এতদিন পর আজ খালেদের বীরত্ব এমন করে আমার চোখে পড়লো। ৭২ ঘণ্টা ক্ষমতায় থেকেও খালেদের হাতে এক ফোঁটা রক্তও যে ঝরেনি; তাঁর উন্মত্ত হিংসার আগুনে তাঁর প্রতিপক্ষ যে কীটপতঙ্গের মতো ভস্মীভূত হয়নি— এখানেই তিনি বড়। সবসময় বৈষয়িকভাবে জয়ী হওয়াটাই বড় কথা নয়। খালেদ হয়তো অন্যায়ের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে রাতভর সুবাস ছড়িয়ে, কুয়াশাঢাকা ভোরে শীতের শেফালির মতো ঝরে যাওয়াটাকেও মূল্যবান বলেই মনে করেছিলেন। সামান্য সময়ের পরিচয়ে, কবিতা প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে খালেদ আমাকে বলেছিলেন, তিনি কবিতা ভালোবাসেন। হয়তো কবির মতোই ভেবেছিলেন তিনি, ‘যদি মরে যাই ফুল হয়ে যেন ঝরে যাই।’

খালেদ ঐ অভ্যুত্থানে জয়ী হননি বলেই, তিনি ব্যর্থ, এমন চিন্তাকে আমি আজ আর সমর্থন করবো না। আমি বলবো, প্রতিপক্ষকে পতঙ্গের মতো নিধন করে জয়ী হওয়ার রাজনৈতিক ধারণাটিকেই তিনি তাঁর ঐ ব্যর্থ-অভ্যুত্থানের ভিতর দিয়ে চ্যালেঞ্জ করে গেছেন। তিনি এমন এক উচ্চতর মানবিক ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন যে, শত্রু হলেও মানুষ মানুষই। কোনো অবস্থাতেই মানুষ কীট-পতঙ্গ নয়। শত্রুকেও কীট-পতঙ্গের মতো (১৫ আগস্ট ও ৩ নভেম্বর-এ যেমন ঘটেছে) হত্যা করাটা অন্যায়। জয়ী হওয়ার জন্য খালেদ এমন কাজ করেননি।

তাই, খালেদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে আগামী দিনের ইতিহাসবেত্তারা নির্দ্বিধায় এমন দাবি করতে পারবেন যে, খালেদ ছিলেন আপাদমস্তক মানবিক। খালেদের প্রতিপক্ষ ছিল বর্বর, নিষ্ঠুর এবং অমানবিক। মানবিকতার চর্চা করতে গিয়ে খালেদ তাঁর জীবন দিয়েছেন বটে, কিন্তু তার এ জীবনদান ব্যর্থ হয়নি। এই মূল্যবান সত্যটি তিনি প্রমাণ করে যেতে

পেরেছেন যে, ১৯৭১ সালে তিনি বর্বরতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। বর্বরতার পক্ষে নয়। অনেকেই তা পারেনি। তারা সাময়িকভাবে জয়ী হলেও, শেষ-বিচারে তারা পরাজিত হয়েছেন। শুধু মানবিক ইতিহাসের বিচারেই নয়, রোজ হাসরের দিনে, মনে করি তা সর্বশক্তিমান আল্লাহর বিচারেও সত্য বলেই গণ্য হবে। খালেদ কাউকে খুন করেননি। এটা আমাদের অনেকের চোখ এড়িয়ে যাওয়া খুব বড় একটা ঘটনা।

রমনা হাজতে; পাকা মেঝের ওপর হাত দুটোকে বালিশ বানিয়ে তার ওপরে শুয়ে শুয়ে আমি আমাদের রক্তাক্ত ইতিহাসের পাতাগুলো উল্টেপাল্টে দেখছিলাম। আমি যে কেন এমনভাবে এ-দেশের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লাম। আমি কি চাইলে অন্যরকম কবিতাও লিখতে পারতাম না? জীবনানন্দের মতো। হাসান যেমন লেখে। পারতাম। কিন্তু আমি যে কেন সুকান্তের মতো এতো স্পষ্ট করে রাজনৈতিক বিষয়নির্ভর কবিতা লিখতে গেলাম? আমার বাবার কথা খুব মনে পড়লো। তিনি আমাকে ঢাকায় আসতে দিতে চাননি। আমার মৃত্যুর খবর পেয়ে বাবা কী কষ্টটাই না পাবেন। তাকে সহ আমার পুরো পরিবারটিকে এভাবে কষ্ট দেয়াটা কি আমার উচিৎ হলো? আমাকে ১৯৭১-এ ভারত থেকে যিনি বাংলাদেশে ফিরতে দিতে আগ্রহী ছিলেন না— আমার সেই বড় ভাই যখন জানবে আমি নেই, তখন? ভুল হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত আমি বেঁচে যাবো, এমন ভাবনা আমার মনে তখন একেবারেই আসছিল না।

আমার প্রিয় পরমায়ুকে প্রসারিত করে দিয়ে একটি নিদ্রাহীন রজনীর অবসান হয়। পাখির কিচির-মিচির শব্দে মগবাজারে, রমনা থানার হাজতে ভোর আসে। আর কাক ডাকা ভোরের দিকে আমাদের হাজত- ঘরটি পরিষ্কার করার জন্য একজন মেথরের আগমন ঘটে। তার নামটি আজ আর মনে নেই আমার। তখন জেনেছিলাম। আমি তার সঙ্গে কথা বলে তাকে একটা কাজ দিই। বলি, এই ঠিকানাটা তুমি তোমার কাছে রাখো।

ঐ ঠিকানায় আমার এক বন্ধু থাকেন। উনার নাম মহাদেব সাহা। তুমি তার কাছে গিয়ে আমার কথা বলবে। বলবে আমাকে ধরে এখানে রেখে গেছে। তিনি তোমাকে যাতায়াত ভাড়া ছাড়াও কিছু টাকা বখশিস দেবেন। আমার কাছে বেশি টাকা নেই। এই টাকাটা রাখো। বলে তার হাতে পাঁচ টাকার একটা নোট গুঁজে দিই। বলি, পারবে তো? আমার চিরকুটটি লুকিয়ে কোমরের ভাঁজে গুঁজতে লোকটি বললো, খুব পারবো। আপনি কিচ্ছু চিন্তা করবেন না, বাবু।

লোকটি আমার চিরকুট নিয়ে বেরিয়ে গেলে আমার মনে একটু স্বস্তি ফিরে আসে এই ভেবে যে, অতঃপর মহাদেব আমার খবর জানতে পারবে। বাসায় না ফিরে যাওয়াতে মহাদেব ও নীলা নিশ্চয়ই আমার দুর্ঘটনার কথা আঁচ করতে পেরেছে। এতক্ষণ আমি ছিলাম আমার প্রিয়- পরিচিতজনদের থেকে বিচ্ছিন্ন। ভাবলাম, এই চিরকুটটি আমাকে আমার প্রিয়জনদের সঙ্গে যুক্ত করতে সাহায্য করবে। (ঐ লোকটি ঐ চিরকুট যথাসময় মহাদেবের বাসায় পৌঁছে দিয়েছিল এবং নীলার কাছ থেকে সংবাদ পৌঁছে দেবার বখশিস হিসেবে একটি পঞ্চাশ টাকা নোট আদায় করেছিল বলে নীলা সম্প্রতি দাবি করেছে।)

সকালে হাজতিদের সবাইকে তন্দুর রুটি আর লাউ ভাজি খেতে দেয়া হয়। সকলের সঙ্গে মিলে আমিও তাই খেলাম। পেটের ভালোমন্দের কথা ভেবে আর লাভ নেই। দেহই যদি না থাকে, তো পেট ভালো রেখে আর লাভ কি? হাইকোর্টের মাস্তান-বন্ধুদের কারণে হাজতে সিগারেটের অভাব ছিল না। বিশেষ ব্যবস্থায়, দারোগা সাহেবের নির্দেশে একটু চা-ও দেয়া হলো আমাকে।

এরই মধ্যে মহাদেব এসে থানায় হাজির। মহাদেবকে খুবই বিধ্বস্ত দেখায়। বুঝতে পারি রাতভর আমার মতই মহাদেবের ওপর দিয়েও একটা বড়রকমের ঝড় বয়ে গেছে। আমাকে সপ্রাণ দেখতে পেয়ে, মহাদেব খুবই স্বস্তিবোধ করলো। মহাদেবকে দেখে আমিও হালে পানি পাই। বলি, দোস্ত, আমাকে যত তাড়াতাড়ি পারো এই নরক থেকে উদ্ধার করো। সারারাত কী টেনশনের মধ্যেই না কাটিয়েছি। থানা- হাজত-কারাগার কখনও কবির বাসস্থান হতে পারে

না।

কিন্তু কী করা যায়, তা মহাদেবও যেমন ভেবে পাচ্ছিল না— আমিও তেমনি ভেবে পাচ্ছিলাম না। কাকে বললে কাজ হবে, কাকে বলা দরকার, কিছুই ঠিক মতো ভাবতে পরছিলাম না। পরে দুজনের মিলিত পরামর্শ অনুযায়ী আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ এবং দৈনিক বাংলায় কবিদের শরণাপন্ন হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে মহাদেব বিদায় নেয়।

সকাল দশটার দিকে শুরু হয় হাজতিদের কোর্টে নিয়ে যাবার আয়োজন। নিয়ম হলো ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই হাজতিদের হাজির করতে হয়। সেখান থেকে কেউ খালাস হয়ে যায়, কেউ যায় কেন্দ্রীয় কারাগারে, কেউ আবার পুলিশ রিমাণ্ডে থানায় ফিরে আসে। আমি ভেবেছিলাম, আমাকে কোর্টে নেয়া হবে না। পরে যখন বুঝলাম আমাকেও কোর্টে নেয়া হবে তখন ভাবলাম, অন্য সব কম-গুরুত্বপূর্ণ আসামিদের যেভাবে কোমরে দড়ি দিয়ে লট বাঁধা হচ্ছে, আমাকে সেরকম করে বাঁধা হবে না। আমি আর্মির হাতে ধড়া পড়া লোক। তা ছাড়া আমি একজন কবি। আমার একটা পৃথক মর্যাদা আছে। কিন্তু না, কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি রশিতে আমাকেও কোমর পেঁচিয়ে শক্ত করে বাঁধা হলো। হাতে ঐ বিখ্যাত হ্যাণ্ডকাপ, খুব ছোটবেলা থেকে নাটকে-সিনেমায় যেগুলো দেখে আসছি। কোনোদিন হাতে ছুঁয়ে দেখিনি। আজ যখন আমার নিজের হাতেই আক্ষরিক অর্থে শোভা পেলো, তখন আর না দেখে কী চলে? আমার দুই হাত একসঙ্গে বাঁধা। এক ধরনের থ্রিল অনুভব করলাম তাতে। আজ একটু ছেলেখেলার মতোই লাগে ঐদিনটির কথা ভাবতে, কিন্তু ঐ দিন ঐ হ্যাণ্ডকাপগুলো নকল নয়, সত্যিকারের হ্যাণ্ডকাপই ছিল

কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের সবাইকে পুলিশ-ভ্যানে তোলা হলো। বিরাট ভ্যান। উপরের দিকে জালি কাটা। তাতে চোখ লাগিয়ে বাইরের লোকজনদের চলাচল দেখা যায়। আমরা সবাই ঐ জালিপথে চোখ রেখে বাইরের আকাশ-বাতাস, লোকজন, গাড়ি রিকশা ও ঢাকার ব্যস্ত রাজপথ দেখতে-দেখতে চললাম পুরনো ঢাকায়, কোর্টে।

কোর্টে যাবার পর নিয়মমতো আসামিদের ছবি তোলার জন্য একটি নির্জন কক্ষে আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো। আমিও গেলাম। সেখানে একজন একজন করে আসামির ছবি তোলা হচ্ছে। একসময় আমার ছবিও তোলা হলো। যিনি ছবি তুলছিলেন, তিনি আমাকে মুখটা সোজা করে দেবার ছল করে আমার কানের কাছে মুখ এনে বললেন, আপনাকে চিনি। আমি বাংলা একাডেমীতে আপনার কবিতা আবৃত্তি শুনেছি। আপনার এই ছবির একটি কপি আমি আমার কাছে রেখে দেবো। পরে আপনাকে দেবো। আমার শুনে খুব ভালো লাগলো। বললাম, যদি বাঁচি তবে তো। আমাকে ওরা কোথায় নিয়ে যাবে, আপনি কি কিছু অনুমান করতে পারেন?

তিনি আমার সঙ্গে বেশি কথা বলতে সাহস পাচ্ছিলেন না। পুলিশ তাকে তাড়া দিচ্ছিল। তিনি দ্রুত ক্লিক ক্লিক করে পরপর আমার দুটো ছবি তুললেন। যাবার সময় আমি ঐ আলোকচিত্রশিল্পীকে বললাম, ভাই, আমি যদি আর না থাকি, তবে আমার এই শেষ-ছবিটা আপনি আমার পরিবারের কাছে পৌঁছে দেবেন। কবি মহাদেব সাহার কাছে পৌঁছে দিলেও চলবে। তিনি বললেন, আপনি ভাববেন না। আমি যতটা পারি মানুষজনকে আপনার খবর জানিয়ে দেবো।

ছবি তোলার পর আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো একজন হাকিমের এজলাশে। সেখানে পুলিশ আমাকে তিন দিনের রিমাণ্ড চাইলে, মাননীয় হাকিম পুলিশের দাবি মেনে নিয়ে আমাকে রমনা থানার হাজতে ফিরে যাবার নির্দেশ দিলেন। তিনি আমাকে ভালো করে তাকিয়ে দেখলেনও না। আমি ভাবছিলাম, আমাকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠালেই ভালো হয়। তাতে আর্মি এসে আমাকে সহজে নিয়ে যেতে পারবে না। কিন্তু তা আর হলো না। আমি একটা বড় রকমের মারের অপেক্ষা নিয়ে রমনা থানায় ফিরে গেলাম।

১১ তারিখের রাতে একজন অপরিচিত যুবক আমার আর্মির হাতে এ্যারেষ্ট হওয়ার খবরটি মহাদেবের বাসায় পৌঁছে দিয়েছিল। মহাদেব তখন বাসায় ছিল না। সে গিয়েছিল

পিজিতে। হাসানের কাছে। হাসানের কাছ থেকে বাসায় ফিরে এসেই মহাদেব নীলার কাছে আমার আর্মির হাতে এ্যারেস্টের খবরটি পায়। নীলার কাছে শুনেছি, মহাদেব ঐ খবর পেয়ে ছোটদের মতোই অঝোরে কাঁদতে শুরু করেছিল। মহাদেব, মনে হয় ঐ রাতেই আমার জন্য বরাদ্দ ওর কান্নাটুকু কেঁদে শেষ করে ফেলে থাকবে। তখন দশটার পর ঢাকায় কার্য্য শুরু হয়ে যেতো। হাতে ঘণ্টাখানেকের চেয়ে কম সময়। এর মধ্যেই মহাদেব বাইরে বেরুবার জন্য যখন তৈরি হলো, তখন মহাদেবকে বিরত করতে না পেরে ওর বাসার মালিকের (ক্যাপ্টেন রব সাহেব, তিনি একজন মুসলিম লীগার ছিলেন) ছেলে হাবিব মহাদেবের নিরাপত্তার কথা ভেবে তার সাথে যায়। ঐ রাতেই মহাদেব আমাদের কবি-বন্ধুদের দু'একজনের বাসায় গিয়ে আমার বিষয়টি নিয়ে কথা বলে। কিন্তু তাদের কাছ থেকে খুব ভালো সাড়া পাওয়া যায় না। আমার খবর পেয়ে তারা খুবই ভয় পেয়ে যায়। ভাবে, আমার কেসটি নিয়ে মুভ করতে গেলে হয়তো নিজেদেরই বিপদ হতে পারে। আমি এজন্য আমার বন্ধুদের খুব একটা দোষ দিই না, কেননা, তখনকার পরিস্থিতিটা আজকের দিনের আলোকে ঠিক বোঝা যাবে না। মহাদেব কার্য্যর মধ্যে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে বাসায় ফিরে আসে মহাদেব ভেবেছিল, রাতের মধ্যে যদি আমাকে প্রয়োজনীয় প্রোটেকশন দেয়া না যায়, তবে হয়তো আর সময় না-ও পাওয়া যেতে পারে। তাই সে খুবই বিচলিত হয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো কার্য্যর মধ্যেই বেরিয়ে পড়েছিল- কিছু একটা করার আশায়। কিন্তু পারেনি। আমি বুঝতে পারি, ঐ কিছু করতে না পারার ব্যথা মহাদেবকে কতটা কষ্ট দিয়েছিল সেদিন।

পরদিন তরুণ কবি মোস্তফা মীর এবং আমার ছোট ভাই শৈবালেন্দু (তখন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তো) লোকমুখে ছড়িয়ে-পড়া আমার গ্রেফতার হওয়ার খবর পেয়ে মহাদেবের বাসায় আসে এবং মহাদেবের সঙ্গে এসে যুক্ত হয়। তাতে মহাদেব এবং আমার বল বাড়ে। মহাদেব তরুণ কবি মোস্তফা মীর ও আমার ছোট ভাই শৈবালেন্দুকে সঙ্গে নিয়ে আমাকে মুক্ত করার জন্য সাহায্য চাইতে দৈনিক বাংলায় যায়। সেখানে আমাদের বড়-কবি ও বড়-সাংবাদিক কাজ করেন। কবি শামসুর রাহমান, কবি আহসান হাবীব, কবি মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, সাংবাদিক আহমেদ হুমায়ুন, শ্রী নির্মল সেন – এঁদের সঙ্গে আমার ব্যাপারে মহাদেবের কথা হয়। তাঁদের কাছে মহাদেব আমার মুক্তি চেয়ে একটি বিবৃতি প্রদানের অনুরোধ করে। তাঁরা আমার বিষয়টি নিয়ে ভাবতে রাজি হলেও কিছু বলতে রাজি হননি। আমার জন্য কিছু করা তো দূরে থাক, আমার বিষয়টি নিয়ে নিজের ওপর ঝুঁকি না বাড়িয়ে বাসায় ফিরে যাবার জন্যই সেদিন তাঁরা মহাদেবকে পরামর্শ দিয়ে বিদায় করেছিলেন। মহাদেব অবশ্য সেদিন তাঁদের প্রদত্ত ঐ পরামর্শটি মেনে চলেনি।

১১ তারিখ রাতে, মহাদেবকে বাসায় না পেয়ে ঐ অচেনা যুবকটি পিজি হাসপাতালে গিয়ে আবুল হাসানকে আমার এ্যারেস্ট হওয়ার খবর জানায়। তাকে দেখতে গিয়ে আমার আর্মির হাতে এ্যারেস্ট হওয়ার কথা শুনে আবুল হাসান খুবই ব্যথিত হয়। মহাদেব এবং আবুল হাসানের চিঠি পেয়ে আমি যে ঢাকায় ফিরে এসেছিলাম— এটি পৃথক-পৃথকভাবে হাসান এবং মহাদেব, দু'জনের মধ্যেই এক ধরনের গিল্টি ফিলিং তৈরি করেছিল। সুস্থ থাকার কারণে, এবং পরবর্তি টার্গেট হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকার ভয়ে, সর্বোপরি বন্ধুত্বের টানেই মহাদেব আমাকে মুক্ত করার জন্য জীবনপণ করে মাঠে নেমেছিল, কিন্তু নীরবে উদ্বিগ্ন বোধ করা এবং হাসপাতালের শয্যায় শুয়ে শুয়ে পরমকরুণাময়ের কাছে আমার মুক্তির জন্য প্রার্থনা করা ছাড়া, আবুল হাসানের পক্ষে আর কিছুই করার ছিল না। কে ছিলো ঐ অচেনা যুবক? আজ পর্যন্ত আমরা তার কোনো হদিস পাইনি।

আমার ব্যাপারে পুলিশের সঙ্গে আর্মির কোনোরূপ যোগাযোগ হয়েছে কি-না, তা জানতে চাইলে পুলিশ না-সূচক জবাব দেয়। সরকারের নানাধরনের গোপন এজেন্সি থাকে। আমার কেসটি ডিল করার জন্য কোন্ এজেন্সিকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, তা বুঝে উঠতে পারছিলাম না। তবে রমনা থানা কর্তৃপক্ষ আমার ব্যাপারে যে নির্বিকার ছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। প্রবল অনিশ্চয়তার মধ্যেই আমি সময় কাটাতে বাধ্য হচ্ছিলাম। আমার যেমন স্বভাব, আমার

ইচ্ছার বাইরে আমি একটি মুহূর্তও কাটাতে পারি না। আর এখন? আমার স্বাধীন—সার্বভৌম কবি- চিত্তের ওপর অস্ত্রের জোরে চাপিয়ে দেয়া এই নিষ্ঠুর অবদমন, কী অসহ্য! অথচ মুখ বুজে সহ্য করা ছাড়া, এ-মুহূর্তে আমার কিছুই করার নেই। কিচ্ছু করার নেই, এমন কি এরা যদি আমাকে মেরেও ফেলে, তবুও। সুতরাং আমাকে যে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে, ভাবলাম এটাই আমার লাভ। বর্বরতা যখন রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখলের ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, তখন রাষ্ট্রজীবন থেকে ন্যায়-নীতি আইন-কানুনসহ যাবতীয় মূল্যবোধই অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। বাংলাদেশ এখন সেরকমই একটা প্রচণ্ড দুঃসময় অতিক্রম করছে। অনেকের মতো আমিও সেই দুঃসময়ের শিকার। এ নিয়ে দুঃখ করে লাভ নেই। দুঃখজয়ের শক্তি অর্জন করাটাই এখন আমার কাজ।

দ্রুতই আর্মির হাতে আমার গ্রেফতার হওয়ার খবরটি ঢাকায় ছড়িয়ে পড়ে। তাতে আমাকে বিনাবিচারে, গোপনে গায়েব করে দেয়ার সম্ভাবনা হ্রাস পায়। আমিও কিছুটা স্বস্তিবোধ করি। আমাকে কেন কোর্ট থেকে রিমাণ্ডে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে, সারাদিন তার কোনো প্রমাণ পাওয়া গেলো না। আমার সম্পর্কে পুলিশের রহস্যজনক নীরবতা সারাদিনই বজায় থাকলো।

সন্ধ্যার দিকে, মাগরিবের আজানের পর, বেশ ক'জন সিভিল পোশাক পরা গোয়েন্দা কর্মকর্তা রমনা থানায় আসেন। তাদের নির্দেশমতোই আমাকে হাজতের গেট খুলে বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। আমি ধারণা করি, কর্নেল সাহেবের নির্দেশেই ঐ গোয়েন্দারা আমার সম্পর্কে তদন্ত করতে এসেছে। আমাকে হাজত থেকে বাইরে নিয়ে যাবার সময় একজন সহআসামি আমার হাতে একটি ট্যাবলেট গুঁজে দিলো। বললো, দাদা পুলিশকে বিশ্বাস নেই। এর এখন মুখে যত ভালো কথাই বলুক না কেন, কখন যে টর্চার করতে শুরু করবে বলা যায় না। এই ট্যাবলেটটি সঙ্গে রাখুন। আন্তরিকতার স্পর্শযুক্ত ঐ ট্যাবলেটটি সাদরে গ্রহণ করে আমি অজানার উদ্দেশ্যে হাজতের বাইরে পা রাখি ভগবান জানেন, আমাকে এখন কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে।

হাজতে যেসব আসামিকে ধরে আনা হতো— আমি গত দু'দিন ধরে দেখছি, পুলিশ তাদের একেকজনকে একেক সময় ধরে বাইরে নিয়ে যায় ইন্টারোগেট করার জন্য। পুলিশের ইন্টারোগেট মানে খুবই কঠিন ব্যাপার। পুলিশের কাছে টর্চার হচ্ছে ইন্টারোগেটের সুফল লাভের বিশ্বস্ত উপায়। বিশেষ করে রাতের দিকেই ঐ টর্চার-কর্মটি চলতো। কিল-ঘুষি, লাথি-চড়-থাপ্পড় ছাড়াও আরও বিভিন্ন উপায়ে আসামিদের টর্চার করা হতো। আসামিদের আর্ত-চিৎকারে থানার আকাশ বাতাস ভারি হয়ে উঠতো। যখন আসামিটি মার খেতে খেতে প্রায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলার উপক্রম হতো, তখন পুলিশরা একটি মৃতদেহকে চ্যাংদোলা করে ধরে আনার মতো করে আসামিটিকে নিয়ে এসে হাজতের ভিতরে শুইয়ে দিয়ে চলে যেতো। তখন অত্যাচারিতের দেহের ভিতরে এখন ও যে প্রাণটুকু অবশিষ্ট আছে, তার প্রমাণ পেতে আমাকে বেশকিছুক্ষণ উদ্বেগের সঙ্গেই অপেক্ষা করতে হতো। আমি খুবই ভয় পেয়ে যেতাম। মনে হতো লোকটি হয়তো আর বাঁচবে না। পরে মানুষের বেঁচে থাকার শক্তিও যে বই অসীম— তাও লক্ষ্য করতাম। কিছুক্ষণ পরেই দেখতাম ঐ মৃত্যুপথযাত্রীটির জ্ঞান ফিরে এসেছে এবং আমাদের দিকে তাকিয়ে জলের জন্য ইঙ্গিত করছে। তখন তার মুখে জল ঢেলে দিতো অন্য আসামিরা। সঙ্গে ঐ পেইনকিলার ট্যাবলেট। চুরি-ডাকাতি-ছিনতাই ও মারামারি-হানাহানির অপরাধে ধৃত আসামিরাই শংকার মধ্যে থাকতো বেশি। পলিটিক্যাল আসামিরা সেইদিক থেকে কিছুটা দুর্ভাবনামুক্ত ছিল। কর্নেল সাহেবের দয়ায় আমি কম বেশি পলিটিক্যাল আসামির মর্যাদাই ভোগ করছিলাম। আমাকে চোর-ডাকাতের মতো ট্রিট করা হচ্ছিল না। ১৮ নভেম্বরের জনসভার প্রচারকার্যে নিয়োজিত জাসদের ছাত্র-কর্মীদেরও পুলিশ টর্চার করেছিল বলে আমার মনে পড়ে না। খুব সম্ভবত ১২ তারিখেই ওরা কোর্ট থেকেই জামিনে মুক্ত পেয়ে চলে গিয়েছিল অথবা ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে স্থানান্তরিত হয়েছিল। আমি ঠিক মনে করতে পারছি না। ১২ তারিখ থেকে রমনা থানার হাজতে কিছুটা পলিটিক্যাল

চাট যুক্ত আসামি বলতে ছিলাম আমি একাই। অন্য সব আসামিরা ছিল চুরি-ডাকাতি, মরামারি, ছিনতাই, খুন এইসব অভিযোগে ধৃত। লালশালু পরা, হাতে লোহার কয়ড়া লাগানো ঢাকা হাইকোর্টের বটবৃক্ষতলবাসী গঞ্জিকাসেবীরাও জামিনে মুক্তি পেয়ে গিয়েছিল। তাই বলে হাজতটি ফাঁকা হয়ে যায়নি। বড় নগরীর থানার হাজত কখনও ফাঁকা থাকে না। এ হচ্ছে লক্ষ্মীর ঝোলা। ভরাই থাকে। আর হাজত ভরা থাকলে, কে না জানে যে, তাতে দেশের লাভ, উকিলদের লাভ এবং পুলিশের লাভ।

পুলিশের অভয় সত্ত্বেও আমি মানসিকভাবে পুলিশের কঠিন- ইন্টারোগেশনের মুখোমুখি হবার জন্য মনে-মনে তৈরি হয়েছিলাম। আমাকে দোতলায় একটি ঘরের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হলো। পকেটে রাখা পেনইকিলার ট্যাবলেটে হাত রেখে আমি গিয়ে বসলাম গোয়েন্দাদের মুখোমুখি একটি চেয়ারে। আমাকে ঘিরে পাঁচ ছয় জন আইবির লোক। আমি স্থির করেই রেখেছিলাম, আমি একটি বর্ণও মিথ্যা বলবো না। আমি আমার ব্যাপারে যা সত্য তাই বলবো। কোনো তথ্য গোপন করবো না। তাতে যা হবার হবে। আমার মনে হয়েছিলো, মিথ্যা পরিচয়ে বাঁচার চাইতে সত্যপরিচয়ে মরাটাও আমার জন্য উত্তম হবে। আর আগেই বলেছি, আমি কোথা থেকে, কোন দূরের ভুবন থেকে যেন সাহস পাচ্ছিলাম। আমার মরণের ভয় আর ছিল না। আমি হাজতের ভিতরে এককোণে বসে পাহারারত সেন্ট্রি-পুলিশের বুলেটবেল্টের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। পুলিশ বলতো, কী দেখেন, কবি সাব? আমি বলতাম, দেখছি আপনার কোমরের বুলেটগুলো। আপনি কোমরে বহন করছেন বলে ভাবছেন— এগুলো আপনার। আপনি এগুলোর আসল মালিক নন। আপনি হচ্ছেন বাহক। পুলিশ ঠিক বুঝে উঠতে পারতো না আমার রসিকতাটা। বলতো, তার মানে? তখন আমি রহস্যভেদ করার মতো করে বললাম, জীবনের বিনিময়ে এই বুলেটগুলোকে যারা দেহে ধারণ করবে, বুলেট হচ্ছে তাদেরই।

আমার ঐ কথা বলার পর হাজতচত্বরে এক ধরনের নিস্তব্ধতা নেমে আসতো।

গোয়েন্দা পুলিশরা, তাই আমাকে যতটা অপ্রস্তুতভাবে পাবে বলে ভেবেছিল, ততটা অপ্রস্তুত অবস্থায় তারা আমাকে পেলো না। প্রশ্নের ধরণ শুনেই আমি বুঝতে পারলাম, এটি একেবারেই পুলিশের রুটিন ওয়ার্ক। আমার বাবা-কাকারা এরকম প্রশ্নের উত্তর বিগত পাকিস্তান আমল থেকেই দিয়ে আসছেন। দেশটা যে আবার পাকিস্তানের পথে এগিয়ে চলতে শুরু করবে— তাদের প্রশ্নের মধ্যে আমি তারই আভাস পেলাম। আমাকে তারা ১৯৭১-এ আমার অবস্থান ও ভূমিকা থেকে শুরু করে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত আমার অবস্থান, আমার প্রতিক্রিয়া জানবার জন্য যতরকম প্রশ্ন করা হতে পারে, তাই করলো। আমি প্রতিটি প্রশ্নের দ্রুত উত্তর দিলাম। তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে আমার বরং ভালো লাগছিল এই ভেবে যে, আমি মন খুলে আমার সকল দুঃখ-বেদনার কথা বাংলাদেশ সরকারের পুলিশদের জানাতে পারছি। এবং তারা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে আমার বলা কথাগুলো সরকারি নথিপত্রে লিপিবদ্ধ করছেন। আমি যে ১৫ আগস্ট ও ৩ নভেম্বরের জেল হত্যার ঘটনায় খুবই ব্যথিত হয়েছি, আমি যে পাগল হয়ে গ্রামের বাড়িতে ফিরে গিয়েছিলাম, তা বললাম। ভারতে যে আমার অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনরা রয়েছেন তাও জানালাম। খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্নের উত্তরে বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর পরিবারের সঙ্গে আমার পরিবারের দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ট সম্পর্কের কথাও আমি সানন্দেই স্বীকার করলাম।

একজন গোয়েন্দা বললেন, ১৫ আগস্টের পর আপনাকে মোহাম্মদপুর এলাকায় কাদের সিদ্দিকীর জিপে উঠতে দেখা গেছে। সত্য?

আমি বললাম, না, কথাটা সত্য নয়। আমি একটু জোরের সঙ্গেই বললাম, ভাই ১৫ আগস্টের পর আমার সঙ্গে কাদের সিদ্দিকীর যদি দেখা হতো, তবে আমি কি আর এখানে থাকি? সে-ও আমাকে নিশ্চয়ই ঢাকায় রেখে যেতো না।

আপনি কি তবে ১৫ আগস্টের পর গ্রামের বাড়িতে যাবার নাম করে অন্য কোথাও

গিয়েছিলেন?

বুঝলাম ওরা আমাকে সীমান্তের ওপারে কাদের বাহিনীতে পাঠাতে চাইছেন।

আমি বললাম, না ভাই, আমি পুরো সময়টা আমার গ্রামের বাড়িতেই ছিলাম। আপনারা তদন্ত করে দেখতে পারেন। আমি একটু ভীতু ধরনের মানুষ। আমার সাহস কম। আমি অস্ত্র হাতে নিতে ভয় পাই। ১৯৭১- এও আমি অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করার সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারিনি।

আপনি খালেদ মোশাররফকে চিনতেন?

একদিন খুব অল্পসময়ের জন্য তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। খুব সামান্যই কথা হয়েছে। কুশল বিনিময়। এটাকে ঠিক চেনা বলা যাবে না।

তার জন্য আপনার দুঃখ হয়?

আমি বললাম, হয়। প্রতিটি অকাল ও অপঘাত মৃত্যুর জন্যই আমার দুঃখ হয়।

আপনার এক বন্ধু নাকি পিজিতে অসুস্থ। ঠিক তো? কী যেন নাম তার?

আবুল হাসান। পিজিতে খোঁজ করলেই জানতে পারবেন। তিনি খুবই অসুস্থ।

তাঁকে দেখার জন্যই আপনি পিজিতে গিয়েছিলেন, নাকি অন্যকিছু?

অন্যকিছু হতে যাবে কেন? আপনারা খোঁজ নিয়ে দেখুন।

জাসদের মুখপত্র গণকণ্ঠে আমি যে একসময় কাজ করেছি এবং জাসদের নেতাদের সঙ্গে আমার যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, সে প্রসঙ্গেও তারা জানতে চাইলো।

আমি বললাম, এদের সবাই আমার দীর্ঘদিনের পরিচিত

কর্নেল তাহেরকে চেনেন?

আমি বললাম, নেত্রকোনার লোক হলেও কর্নেল তাহেরের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় নেই। আমি তাকে নামেই শুধু জানি।

গণকণ্ঠ পত্রিকায় কী করতেন আপনি?

আমি বললাম, আমি সম্পাদকীয় লিখতাম। একটি রাজনৈতিক কলামও লিখেছি। সরকারী আমল। এবং আওয়ামী লীগের কিছু-কিছু নেতা-কর্মীর দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমি ঐ পত্রিকায় লিখেছি। কিন্তু তাই বলে আমি কখনও জাসদের রাজনীতির সমর্থক ছিলাম না। তাদের সঙ্গে আমার বনিবনা হয়নি। গণকণ্ঠে যোগ দেবার সময় আল মাহমুদ চার- নীতির পক্ষে প্রচার চালাবে। বঙ্গবন্ধু ঐ শর্তেই কাগজটির দায়িত্ব রব- সিরাজ-আল মাহমুদের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন। ঐ কাগজে যোগদানে আমারে প্রলুব্ধ করার জন্য আল মাহমুদ আমাকে ঐ কথাই বলেছিলেন জাসদের কথা তখন আসেনি। রব-জলিলের নেতৃত্বে জাসদ গঠিত হওয়ার পর ঐ কাগজটি জাসদের কাগজে পরিণত হয়। আমি জাসদের পক্ষে লিখতে অস্বীকার করায় আল মাহমুদের সঙ্গে আমার বিরোধ হয়। তোহা ভাইয়ের সঙ্গে আল মাহমুদের বিরোধ হয়। তখন ঐ প্রবীণ সাংবাদিক তোহা ভাই (মরহুম তোহা খান)-এর সঙ্গে একাত্মতা প্রবেশ করে আমিও গণকণ্ঠের চাকুরি ছেড়ে দিই।

৭

গণকণ্ঠ ত্যাগ করার পর সাংবাদিক বজলুর রহমানের আহ্বানে আমি কিছুদিনের জন্য সংবাদ-এ যোগ দিই। এক বছরের মাথায় সংবাদ থেকেও আমার চাকুরি চলে যায়। তারপর লেখক-সাংবাদিক রাহাত খানের আহ্বানে আমি কিছুদিন অন টেস্ট বেসিসে উত্তেফাকে লিখেছিলাম। মঈনুল হোসেনের মন জয় করতে পারিনি, তাই চলে আসি। তারপর আর কোনো কাগজে যাইনি। আমি বুঝতে পারি, আমি ঠিক সাংবাদিক নই। অনেকদিন বেকার থাকার পর আমি রেজা আলী ও রামেন্দু মজুমদার পরিচালিত বিটপী এ্যাডভার্টাইজিং ফার্মে কপিরাইটিংয়ের কাজ পাই। সেখানেও বেশিদিন টিকতে পারি না। অফিসের অনুমতি নিয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অনুষ্ঠানে কবিতা পড়তে যাওয়ার অভিযোগে ১৫ আগস্টের কিছুদিন আগে আমার ঐ চাকরিটিও চলে যায়। এরপর থেকে আমি বেকারই ছিলাম। ১৫ আগস্টের পর আমার গ্রামে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পেছনে ওটাও একটা কারণ ছিল। আমি ভেবেছিলাম, আমি তো একলাই। চাকরি হারানোর ভয় আমার আর ছিল না।

আমার ঘণ্টা-দুয়েক স্থায়ী জবানবন্দিটি বেশ কয়েকজন মিলে লিপিবদ্ধ করেন। তারা আমার কথায় ও তাদের উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর শুনে খুব মজা পাচ্ছিল বলেই মনে হয়। ফলে একজন বুড়োমতো মানুষ, মুখে শাদা দাড়ি, আমাকে প্রশংসা করে বলেছিলেন, কবি সাহেব, আপনি খুবই সাহসী এবং সত্যবাদী। আপনি একজন ভালো মানুষ।

আমি বললাম, আমি সত্যবাদী এবং ভালো মানুষও, কিন্তু সাহসী না।

তিনি মাথা নাড়িয়ে বললেন, সত্যবাদী আর সাহসীতে তফাৎ খুবই কম।

আমি বললাম, কী জানি হতে পারে।

ইন্টারোগেশনের এক পর্যায়ে আমাকে একবার চা পরিবেশন করা হলো। আমার সঙ্গে তারাও চা-পান-সিগারেট খেলেন। আমাকেও তারা তাদের সামনে সেদিন সিগারেট খেতে দিয়েছিলেন। আর তখনই পকেট থেকে সিগারেট বের করতে গিয়ে ঐ ট্যাবলেটটির গায়ে হাত পড়েছিলো আমার। আমি তখন একটু হাসতে হাসতেই জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কি এভাবেই আমাকে ইন্টারগেট করবেন? আমাকে মারধোর করবেন না?

আমার কথা শুনে ওরা একটু লজ্জা পেলেন। বললেন, না ভাই। কর্নেল সাহেব তো আপনার সঙ্গে দুর্ব্যবহার না করতে লিখিত নির্দেশ দিয়ে গেছেন। উনিও খুব ভালো মানুষ। তা ছাড়া আপনি তো আর সত্য আড়াল করছেন না। সাহসের সঙ্গে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সত্য কথা বলছেন। সত্য জানার জন্য আপনার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করার তো কোনো প্রয়োজন নেই।

একজন জানতে চাইলেন, আপনার কি হাজতে থাকতে খুব কষ্ট হচ্ছে?

আমি বললাম, না তেমন কিছু নয়। কষ্ট হয় যখন হাজতের অন্য আসামিদের পুলিশ অমানুষিকভাবে অত্যাচার করে। ওদের আর্তচিৎকার শুনে আমার খুব কষ্ট হয়।

কী করা যাবে বলেন, ওরা তো আর আপনার মতো সত্য কথা বলে না। ওরা হচ্ছে ক্রিমিন্যাল।

আমি ক্রিমিন্যাল নই — পুলিশের কাছ থেকে এই স্বীকৃতিটুকু লাভ করার লজ্জায় আমি মাথা নিচু করে থাকি। বলি, এটা একটা সমস্যাই বটে। মানুষ যে কবে সত্য বলার সাহস অর্জন করবে। তবে একথাও তো ঠিক যে, পুলিশরা অনেক সময়ই অর্থের লোভে সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য বলে চালিয়ে দেয়। কনফেশন করার জন্য ক্রিশ্চিয়ান পাদ্রীরা যতটা নির্ভরযোগ্য, সত্য ভাষণের জন্য পুলিশ কি ততটা নির্ভরযোগ্য?

আমার ঐ কথার কোনো জবাব না দিয়েই ওরা আমায় খুশিমনে বিদায় জানায়। বলে, আমরা চাই আপনি মুক্তি পান। তবে আমাদের ইচ্ছাটাই তো শেষ কথা নয়। আর সবকিছুই নির্ভর করবে ঐ কর্নেল সাহেবের ওপর। একজন আমার কানের খুব কাছে এসে আমাকে জানায়, আমাদের হাতে ক্ষমতা থাকলে আমরা আপনাকে এখনই মুক্তি দিতে পারতাম। কিন্তু ঐরূপ ক্ষমতা তাদের ছিল না।

বাংলাদেশকে স্থলপথে তিন দিক থেকে ঘিরে রেখেছে ভারত। আমাদের দক্ষিণে সমুদ্র। সমুদ্রপথেও ভারতেরই দাপট। ঐরকমের একটি বিশাল দেশের প্রতি আমাদের মতো ছোট একটি দেশের দৃষ্টিভঙ্গি কীরকম হওয়া উচিত, এই প্রশ্নে বাংলাদেশের অভিভাবক শ্রেণীর রাজনীতিবিদরা দুটো স্পষ্ট ধারায় ভাগ হয়ে যান। একদল মনে করতে থাকেন— শক্তিশালী ভারতের সঙ্গে আমাদের সৎ-প্রতিবেশীসুলভ সুসম্পর্ক থাকাই ভালো। তাতে আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত হবে। চীনের কাছে ১৯৬২-র যুদ্ধে বিপুল পরিমাণ ভূখণ্ড হারানোর তিক্ত অভিজ্ঞতা ও পাকিস্তানের সঙ্গে অনুষ্ঠিত একাধিক যুদ্ধের অভিজ্ঞতাকে বিবেচনায় রেখে ভারত বিগত বছরগুলোতে তার সামরিক শক্তিকে যেভাবে বাড়িয়ে তুলেছে এবং তুলে চলেছে—, তার সঙ্গে যদি পাল্লা দিয়ে আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার চিন্তা করতে হয়, তা হবে আমাদের মতো একটি ছোট দরিদ্র দেশের জন্য খুবই আত্মঘাতী, অবাস্তব এবং অসম্ভব ব্যাপার। ভারতের বিরুদ্ধে সামরিক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করার তালিকায় পাকিস্তানের মতো বাংলাদেশের নাম লেখানোর বিপদ কতটা ক্ষতিকর হতে পারে, তা অনুভব করে পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করে স্বাধীন দেশের মাটিতে পা রেখেই বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, বাংলাদেশ হবে প্রাচ্যের সুইজারল্যাণ্ড। অর্থাৎ যুদ্ধ নয়, শান্তি। সংঘর্ষ নয়, সম্প্রীতিই হবে বাংলাদেশের পথ। ভারতের সঙ্গে কুসম্পর্ক বজায় রেখে চলাটা যে ভালো নয়, ১৯৭১ সালে পাকিস্তান খুব চড়া মূল্য দিয়ে তা অনুভব করেছে। তাই আমাদের সঙ্গে বৈরি আচরণ করার সুযোগ আমরা ভারতকে দিতে পারি না। ভারতকে বন্ধুত্বের বন্ধনে বেঁধে রাখাটাই হবে আমাদের কাজ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন ঐ ধারার জনপ্রিয় নেতা। বাংলাদেশটিকে তিনি 'মুসলিম বাংলা" বলে মনে করতেন না। মুসলমানদের পাশাপাশি বাংলাদেশ নামক এই ভূখণ্ডে বসবাসকারী হিন্দু- বৌদ্ধ এবং খ্রিস্টান সম্প্রদায়কেও তিনি সর্বদা বিবেচনায় রেখে চিন্তা- ভাবনা করতেন, কথা-বার্তা বলতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, বাংলাদেশের সংস্কৃতি হচ্ছে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টানের মিলিত বিশ্বাস, শ্রম ও ভালোবাসার ফসল। সংস্কৃতির মূলধারাটি অবশ্যই সর্বকালে সর্বদেশে তার বৃহত্তর জনগোষ্ঠিরই ধর্মাশ্রয়ী হয়; খণ্ডিত বাংলার পূর্বপটের সংস্কৃতির মূল ধারাটি তাই বলা বাহুল্য, ইসলামধর্ম নির্ভর কিন্তু তাই বলে ইসলামী সংস্কৃতির চারপাশে ব্যারিকেড দিয়ে তাকে অন্যধর্মনির্ভর সংস্কৃতির সঙ্গে মিলিত হবার পথ রুদ্ধ করে দিতে হবে, না দিলে ইসলামী সংস্কৃতি বিকশিত হবে না, ইসলাম চলে যাবে- ইসলামকে তিনি অতটা ঠুনকো কিছু বলে ভাবতেন না। মরু অঞ্চলের পোশাক পরে মুসলমান সাজার প্রয়োজন আছে বলেও তিনি মনে করতেন না।

এই ধারার বিপরীতে, মুসলিম-বাংলার ভবিষ্যত নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ধারার অনুসারীরা মনে করতেন, ভারতের পথ আমাদের পথ হতে পারে না। ভারত ধর্মনিরপেক্ষতার কথা মুখে যতই বলুক না কেন, মাঝে মাঝে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্য থেকে লোক- দেখানো রাষ্ট্রপতি বা বিমানবাহিনী প্রধান বা রাষ্ট্রসংঘের স্থায়ী প্রতিনিধি তারা যতই নিয়োগ করুন না কেন- এটি হচ্ছে পলিটিক্স। ভারত আসলে একটি ছদ্মবেশী হিন্দুরাষ্ট্র ছাড়া কিছু নয়। 'হিন্দুস্থানই এর যথার্থ নাম। ভারতকে হিন্দুরাষ্ট্র বলাটা যে একইসঙ্গে ভারতে বসবাসকারী বিপুল সংখ্যক মুসলমান এবং বাংলাদেশে বসবাসকারী তার চেয়ে কিছু কম অমুসলমানদের জন্য অপমানজনক, এ দিকটা, তাদের ধর্মান্ধ চোখে ধরা পড়তো না। তারা মনে করতেন, ভারতকে হিন্দুরাষ্ট্র প্রমাণ করতে পারলে বাংলাদেশকে আর কষ্ট করে 'মুসলিম বাংলা' প্রমাণ করতে হবে না। অটোমেটিক্যালি তা প্রমাণিত হয়ে যাবে। সন্দেহ জাগে, ভারতকে হিন্দুর হাতে সঁপে দিয়ে তারা কি বাংলাদেশকে সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রে পরিণত করে এখানে বসবাসকারী সংখ্যালঘুর সম্পদলুণ্ঠনকর্মটিকে সহজ করতে চাইতেন? তারা ভাবতেন ভারত সবসময়ই বাংলাদেশকে শোষণ করার তালে থাকবে এবং আমাদের সঙ্গে বড় ভাই সুলভ আচরণ করবে। তাকে কোনো অবস্থাতেই বিশ্বাস করা যায় না। ভারতকে শক্তির মাধ্যমে মোকাবিলা করার প্রস্তুতি আমাদের থাকা দরকার। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করলেও,

ভবিষ্যতের কথা ভেবেই আমাদের উচিত মুসলিম উম্মার সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক সুদৃঢ় করা। ভারতকে চাপের মধ্যে রাখার জন্য একদলশাসিত, নাস্তিকের দেশ কমিউনিষ্ট চীনের সঙ্গেও সম্পর্কের উন্নতি করা দরকার। পাকিস্তানের মতোই। ১৯৭১ সালে এদের অনেকেই মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিলেন। আবার কেউ কেউ মুক্তিযুদ্ধ করেছিলেনও। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ছিলেন ঐ ধারার সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা। তিনি খুব চমৎকার ভাষায় সাম্প্রদায়িক চুলকানিযুক্ত ভারতবিরোধী বক্তব্য প্রদান করতে পারতেন। তিনি বলতেন, ওপার থেকে দলবেঁধে 'ধুতি পরে আসা হিন্দুরা' সব লুটেপুটে খেয়ে যাচ্ছে। ঐ সুনির্বাচিত চিত্রকল্পটির বদৌলতে ধুতি পরে আসার ভারতীয় হিন্দুরা উপদ্রবকারী বুনো হাতিতে পরিণত হতো। ভারত থেকে আসা ঐসব হিন্দুরা যে বাংলাদেশে বসবাসকারী হিন্দুদের পরমাত্মীয়স্বজনও বটে— ভাসানী সাহেব জেনেও তা না জানার ভান করতেন। ধুতি নামক পরিধেয়টির প্রতি বিদ্রুপ প্রদর্শন করাটাও ছিল খুবই আপত্তিজনক। মিত্রবাহিনী হিসেবে আমাদের সঙ্গে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ দেবার জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পরিবর্তে তিনি বলতেন, ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশে ঢুকে আমাদের হাজার-হাজার কোটি টাকার সম্পদ লুট করে নিয়ে গেছে। সেকারণেই বাংলাদেশের এই দুর্দশা। বাংলাদেশে ঢোকার পর ভারতীয় সেনাবাহিনীর কোনো সদস্য লুটপাটে বা অন্যবিধ অপকর্মে কখনও অংশগ্রহণ করেনি— তা এমনকি ভারতও বলবে না। মিলিটারিরা, তা সে যে দেশেরই হোক, মিশনের পাদ্রী বা মঠের ভিক্ষু নয়, দেশে ফিরে যাবার পর, ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ভারতীয় সেনাবাহিনীর কোনো কোনো সদস্যের অপকর্মের অভিযোগে সামরিক আদালতে বিচার হয়েছিল বলেও শুনেছিলাম। এর মধ্যে লুটতরাজ ও নারী ধর্ষণে অংশ নেয়া অন্তর্ভুক্ত ছিল বলেও শুনেছি। কিন্তু ভাসানী সাহেবের কথামতো, লুটতরাজ করার জন্যই ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশে ঢুকেছিল, লুটতরাজ ও নারী ধর্ষণ ছাড়া তার পেছনে অন্য কোনো মহৎ প্রেরণা বিদ্যমান ছিল না— এমন মিথ্যা ধারণা বিতরণকারীকে আল্লাহও ক্ষমা করবেন না। ১৯৭১-এ বাংলাদেশকে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর হাত থেকে মুক্ত করার জন্য কম করেও বারো হাজার ভারতীয় সেনা প্রাণ দিয়েছিল। ওঁরা হিন্দুস্তানী ছিল বলেই কি ভাসানী সাহেব তাঁদের প্রাণকে এতো তুচ্ছ বলে মনে করতেন? না, এটা খুবই অন্যায় কথা।

৭১-পরবর্তি বাংলাদেশে মওলানা ভাসানী সাহেবই 'প্রগতিশীল সাম্প্রদায়িকতার জন্ম দিয়েছিলেন। ঐ প্রগতিশীল সাম্প্রদায়িকতাকে সেদিন শক্ত হাতে মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধুর সরকার। তার কুফলও তিনি ভোগ করেছেন জীবন দিয়ে, মৃত্যু-অন্তে। ১৫ আগস্টের মতো নারকীয় হত্যাযজ্ঞ বা ৩ নভেম্বরের জেল-হত্যার মতো বর্বর ঘটনা ঘটে যাবার পরও মওলানা ভাসানী ঐরূপ অপকর্মের বিরুদ্ধে টু শব্দটিও করেননি। তাঁর রহস্যময় নীরবতা বঙ্গবন্ধু ও চার নেতার খুনিদের অপকর্মকেই সমর্থন যুগিয়েছিল। বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবদ্দশায় মওলানা ভাসানীকে যথেষ্ট ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন। বঙ্গবন্ধুর একটি মস্ত ভুল ধারণা ছিল যে, মওলানা সাহেব তাঁকে পুত্রবৎ স্নেহ করেন। তাঁকে মওলানা সাহেব ভালোবাসেন। কিন্তু আমার তা কখনও সত্য বলে মনে হতো না। বঙ্গবন্ধুর সপরিবারে নিহত হওয়ার পর, ঐ কথিত রাজনৈতিক পুত্রের রুহের মাগফেরাত পর্যন্ত কামনা করেননি— তাতে মওলানা ভাসানী সম্পর্কে আমার ধারণটিই সত্য বলে প্রমাণিত হয়। এবং সত্যটি প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে আমি খুশি হই।

৭ নভেম্বরে 'সিপাহী বিপ্লবের' মাধ্যমে খুনি-মেঘের আড়াল ভেদ করে যখন লুকানো সূর্য উঁকি দেয়, তখন, দীর্ঘ নীরবতার পর আমরা আবার মওলানা সাহেবকে বিবৃতি নিয়ে দেশবাসীর সামনে হাজির হতে দেখি। ১২ নভেম্বর এক দীর্ঘ বিবৃতির মাধ্যমে ১৫ আগস্ট এবং ৩ নভেম্বরের ঘটনাকে পাশ কাটিয়ে ৭ নভেম্বরের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসা নতুন শক্তিকে আশীর্বাদ করেন এবং দেশবাসীকে আধিপত্যবাদীদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। তাঁর ঐ আশীর্বাদী বিবৃতিটি পরদিনের সরকারী পত্রিকা দৈনিক বাংলার প্রথম

পাতাজুড়ে ফলাও করে প্রকাশিত হয়। তাতে আমি মোটেও অবাক হই না। আমি অবাক হই, যখন দেখি যে, মওলানা ভাসানী তাঁর বাসস পরিবেশিত ঐ বিবৃতিতে সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে হোক— 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র রাষ্ট্রীয় আদর্শটিকে সমর্থন করেছেন।

ঐ বিবৃতিতে তিনি বলেন,... 'বাংলাদেশ বিশ্বসভায় মর্যাদার সঙ্গে এবং একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হিসেবে বেঁচে থাকবে।'

[সূত্র : দৈনিক বাংলা, ১৩ নভেম্বর ১৯৭৫]

যারা মওলানা ভাসানীর ভক্ত, অনুসারী—; যারা ভাসানীকে স্বাধীনতার স্থপতি বলে মনে করেন; প্রকারান্তরে তাঁকে যারা জাতির পিতা বলে খুশি হতে চান, ভেবে পাই না, পরবর্তিকালে সংবিধান থেকে 'ধর্মনিরপেক্ষতা'কে বিসর্জন দিয়ে তারা কীভাবে মওলানা ভাসানীকে অপমান করতে পারলেন। 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র প্রশ্নটি নিয়ে জেনারেল জিয়ার সঙ্গে মওলানা ভাসানীর বিরোধ হয়েছিল, —এমন কোনো তথ্য আমাদের জানা নেই। ভাসানী যদি ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটিকে সত্যিই 'মিন' করে থাকেন, তাহলে তো জেনারেল জিয়ার সঙ্গে তাঁর কোনো এক পর্যায়ে বিরোধ হবারই কথা ছিল। কিন্তু হয়নি। কেন হয়নি? এটা খুবই রহস্যজনক।

আমি যখন রমনা থানার হাজতের ভিতরের নিশ্চলতায় বন্দি ছিলাম, তখন বাইরের পরিস্থিতি ছিল খুবই গতিচঞ্চল। ১৫ আগস্ট ও ৩ নভেম্বরকে পেছনে ফেলে ৭ নভেম্বরের সিপাহী বিপ্লবের মধ্যে নতুন সরকার সবে ক্ষমতায় বসেছে। রাজনীতিবিদদের কনুইয়ের গুঁতোয় হটিয়ে দিয়ে, বাংলাদেশের রাজনীতির নিয়ামক শক্তি হিসেবে অবির্ভূত হয়েছে আমাদের সেনাবাহিনী। সিভিলসমাজ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করে দিয়ে শুরু হয়েছে খাকি পোশাকের দাপট প্রতিষ্ঠার যুগ। সামরিক গণতন্ত্রের রক্তযাত্রা।

সামরিক গণতন্ত্রের ধারণার উদগাতারা চমৎকারভাবে সারা বিশ্বকে, বিশেষভাবে ভারতকে বুঝিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে যে, খোলশের মতো ১৯৭১-এ আমরা পাকিস্তানকে পরিত্যাগ করেছি বটে, কিন্তু পাকিস্তানের রাষ্ট্র-আদর্শকে আমরা ছাড়িনি। পাকিস্তানই আমাদের পথ। পাকিস্তানই আমাদের আদর্শ। পাকিস্তানের মতোই আমরা চলবো সামরিক রথে। সামরিক শাসনের পথে। এই সামরিক শাসনের রথ ও পথের শেষ কোথায়?—তা কেউ জানে না।

১৪ নভেম্বর পড়ন্ত দুপুরের দিকে এক ভদ্রলোক আসেন আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য। আমি আমার ছোটভাই শৈবালেন্দুর দিয়ে-যাওয়া মহাদেব-পত্নী নীলার রান্না করা সুস্বাদু খাবার সাবাড় করে ভারতীয় পশমী চাদরটিকে মুড়িয়ে বালিশের মতো বানিয়ে মাথার নিচে স্থাপন করতঃ পাথরের খাটে ছাদের দিকে চোখ রেখে আরাম করে শয়ন করেছি। স্যাঁতাপরা হাজতঘরের দেয়াল ও ছাদের ওপর চুইয়ে পড়া জলশিল্পীর আঁকা নানারকমের মূর্ত-বিমূর্ত ছবিতে চোখ রেখে কী যেন ভাবছিলাম। বালি খসে পড়া হাজতের চার দেয়ালের মধ্যে কত মানুষের নাম যে লেখা আছে। সেখানে, একটু চেষ্টা করলেই অজস্র রকমের মুখ কল্পনায় নির্মাণ করা সম্ভব। অনেকদিন পর মনে হচ্ছিল ঘুম আসবে। তখনই সেন্ট্রি এসে হাজির হলো আমাদের হাজত-ঘরের সামনে। বললো, কবি সাহেব আপনার লোক। আমি শোয়া থেকে মেঝের ওপর হুড়মুড় করে উঠে বসলাম। যে ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন তাঁকে আমি আগে কোথাও দেখেছি বলে আমার মনে পড়লো না। তাঁর স্বাস্থ্য ভালো। মুখে সুন্দর করে ছাঁটা গোঁফ। গায়ের রঙ কালো। মাথায় চুল একটু কম। কেমন আছো? আমি তাঁর প্রশ্নের কোনো উত্তর দিলাম না। আমি আর্মির গোয়েন্দা বলে ইতোমধ্যেই তাঁকে সন্দেহ করে নিয়েছি। তাই কিছুটা ভয়ে এবং কিছুটা ঘৃণায় আমার মুখ থেকে কোনো কথা বেরুলো না। তিনি বুঝলেন, আমি তাঁকে আস্থার মধ্যে নিচ্ছি না। তিনি আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের কথা বললেন, মহাদেব সাহার কথা বললেন। বললেন, আমি সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে আছি। আমি একজন জয়েন্ট সেক্রেটারি। আমার নাম মোহাম্মদ সিরাজুদ্দিন। কবি সিকানদার আবু জাফরের কথাও তিনি বললেন। এতোগুলো প্রিয় নাম শোনার পর তাঁর

ওপর আমার কিছুটা আস্থা আসে। আমি দরোজার লোহার শিকের ভিতর দিয়ে হাত বাড়িয়ে তাঁর সঙ্গে করমর্দন করি। আমার মুক্তির জন্য প্রয়োজনবোধে রাষ্ট্রপতি সায়েম পর্যন্ত যাওয়া যায় কি-না, তা ভেবে দেখার জন্য তাঁকে অনুরোধ করি। আমার ক্ষীণ প্রত্যাশা ছিল, বিচারপতি সায়েম নিয়ে। মোশতাককে হটিয়ে দিয়ে খালেদ মোশাররফ তাঁকে ক্ষমতায় নিয়ে এসেছিলেন। তিনি খালেদের কোনো উপকারে লাগতে পারেননি। তাঁর মাধ্যমে খালেদের একজন সমর্থক যদি উপকৃত হয়, তবে তা তো তাঁর কিছুটা হলেও ঋণমুক্ত হওয়ার কথা। আমার মন বলছিল, তাঁর কাছে যেতে পারলে কাজ হবে। কিন্তু যাবে কে? সিরাজ ভাই বললেন, আমি দারোগার সঙ্গে আমার পরিচয় দিয়ে কথা বলেছি। তাঁরা তোমার প্রতি সহানুভূতিশীল। তোমাকে শারীরিকভাবে যাতে নির্যাতন করা না হয়, সেজন্য আমি দারোগাকে ওয়াদা করিয়েছি। ভয় নেই। আমি আইজি-র সঙ্গেও কথা বলবো। আমাকে সাহায্য করার আশ্বাস তিনি দিয়ে চলে যান। একজন ঊর্ধ্বতন সরকারী কর্মকর্তা আমার পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করায় আমি খুবই খুশি হই। আমার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। আমি ভাবতে শুরু করি, আমার মুক্তি খুব দূরে নয়।

সম্প্রতি এই লেখা তৈরি করার সময় আমি পূর্ণ সচিব হিসেবে অবসরপ্রাপ্ত সিরাজ ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলে জানলাম, ঐ সময়টাতে তিনি নিজেও আর্মি-প্রহরায় ছিলেন। বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগের নিকটজন হিসেবে মোশতাকের সরকার তাঁর বাড়িতে পাহারা বসিয়েছিল। একজন মেজর সর্বক্ষণ তাঁকে পাহারা দিত। তিনি ঐ মেজরকে সঙ্গে নিয়েই আমাকে সাহায্য করার জন্য রমনা থানায় গিয়েছিলেন। ঐ মেজর সঙ্গে থাকার কারণে রমনা থানার দারোগা সিরাজ ভাইকে খুবই সমীহ করতে বাধ্য হন। উদার মনের অধিকারী সিরাজ ভাই সেদিন আমাকে কিছু সিগারেটও দিয়ে এসেছিলেন, যা আমি হাজতের অন্যান্য আসামিদের সঙ্গে ভাগ করে মহানন্দে পুড়িয়েছিলাম।

১৬ নভেম্বর দুপুরবেলা। হঠাৎ রমনা থানা প্রাঙ্গণ বুটের সঙ্গে চঞ্চল হয়ে ওঠে। স্যালুটের পর স্যালুট চলতে থাকে। এক সঙ্গে আসা বেশ কটি জিপের আওয়াজ পাওয়া যায়। বোঝা যায়, থানায় গুরুত্বপূর্ণ কেউ এসেছেন। আমি তো চুন খেয়ে মুখ-পোড়ানো মানুষ, বুটের শব্দ শুনলেই ভয় পাই। ভাবি, ঐ বুঝি এলো আমার যম। পুলিশদের দৌড়াদৌড়ি শুনে হাজতকক্ষের সকল হাজতি দ্রুত গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসলো। যখন বুঝলাম বুটের শব্দ হাজতের দিকে আসছে, তখন আমার বুকের পালপিটিশন বেড়ে গেলো। সর্বনাশ। না জানি কে এলো আমার দ্বারে। পাছে চোখে পড়ে যাই, সেই ভয়ে আমি অন্য হাজতিদের পেছনে নিজেকে লুকিয়ে ফেলার চেষ্টা করি। কিন্তু লাভ হয় না। পুলিশ হাজতের সামনে এসে সরাসরি আমার নাম ধরে ডাক দেয়। কোথায় কবি সাহেব? আমার জন্য নিশ্চয়ই একটা সুখবর আছে, এরকম মনে করে হাজতের ভিতরের বেশ ক'জন আমাকে সামনের দিকে ঠেলে দেয়। মনের ভিতরে প্রচণ্ড দুর্বিনীত ভাবের সৃষ্টি হলেও, আমি খুবই বিনীত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াই। ঐ পুলিশের পেছনেই দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন পুলিশের একজন বড়কর্তা। আমাকে বেরুতে দেখে তিনি আমার দিকে এগিয়ে আসেন। তিনি নিজেকে ডিআইজি বলে দাবি করেন। আমি তাঁকে আদাব দিই। বলি, এখন আমাকে অন্য কোথাও নিয়ে যেতে এসেছেন বুঝি? তিনি মাথা নেড়ে বললেন, না ভাই, আপনাকে আমরা অনেক কষ্ট দিয়েছি। আর নয়। আমরা এবার আপনাকে মুক্তি দিতে এসেছি।

হাজতের লৌহদরোজাটি খোলা থাকার পরও আমি হাজত থেকে সম্পূর্ণ বেরুচ্ছিলাম না। ৩ নভেম্বরের জেল-হত্যার ঘটনার কথা মনে করে আমি একটু ভয় পাচ্ছিলাম বেরুতে। খাঁচায় বন্দি-পাখির মতোই দরোজা খোলা পেয়েও আমি খাঁচা ছাড়ছিলাম না। ঐ পুলিশ অফিসার আমার দ্বিধাগ্রস্ত ভাবটা ঠিকই বুঝতে পারলেন। তিনি তখন আমাকে নির্ভয় করার জন্য আমার কাছে এগিয়ে এসে আমাকে তাঁর বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বললেন, ভয় কিসের? হাজতের জন্য মায়া হচ্ছে? তাঁর স্পর্শের মধ্যে আমি অভয়বোধ খুঁজে পেলাম। আমি তাঁকে বিশ্বাস করলাম। বললাম, হ্যাঁ, যখন মুক্তির এতো কাছে চলে এসেছি, তখন

সত্যি বলতে কি, এই হাজত ছেড়ে যেতে আমার সত্যিই মায়া লাগছে। একটা পিছুটান আমি সত্যিই অনুভব করছি। ভালোবাসার সুখের স্মৃতি যে মানুষকে পিছু টানে, তা নিজ-জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে জানতাম; অপমান লাঞ্ছিত দুঃখের স্মৃতিও যে মানুষকে পিছু টানে, তা আজ আমার নতুন করে জানা হলো।

হাজতের অন্যসব বন্দি-আসামিরা আমার দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল, তারা সবাই এইরকমের একটি মুহূর্তেরই স্বপ্ন দেখছে। তাদের অনেকের স্বপ্নই হয়তো সফল হবে না। বন্দির কাছে মুক্তির চেয়ে বড় স্বপ্ন আর হয় না। চলে আসার সময় পেছনের দিকে তাকিয়ে যখন আমি ঐ হাজতের মধ্যে গুটিসুটি মেরে নিশ্চুপ বসে থাকা নিজেকে আজ দেখতে পেলাম না, তখন আমি খুবই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লাম। সবার উদ্দেশ্যে বললাম, যাই, আবার দেখা হবে। বললাম বটে, কিন্তু সেটা ছিল নিতান্তই কথার কথা। আমি ঠিকই জানতাম, ঐগুলো শুধুই কথার কথা। তবু বলতে হয়। বলাটাই ভালো। যারা বন্দি, তাদের ঐরকমের আশার কথা শুনতে ভালো লাগে। মিথ্যা হলেও।

হাজত থেকে বেরিয়ে আমি ওসি-র রুমে এসে বসি। আমাদের জন্য চা-বিস্কিট আসে। ডিআইজি সাহেবের সঙ্গে আমিও চা-বিস্কিট খাই। স্বাধীন মানুষ হিসেবে আমি আবার নিজেকে অনুভব করতে শুরু করি। ইতোমধ্যে আমাকে মুক্তি দেবার জন্য যাবতীয় কাগজপত্র তৈরি করা হয়। যে কাগজটি কোর্টে হাকিমের কাছে জমা দেয়া হবে, সেই কাগজে ডিআইজি সাহেব লেখেন '*Honourably released.*'

এমন আকস্মিকভাবে আমাকে যে মুক্তি দেয়া হতে পারে, আমি বা মহাদেব আঁচও করতে পারিনি। ঐ দিন রোববার ছিল। আমি আরও একটি বিনিদ্র রজনী পাড়ি দেবার জন্যই মানসিকভাবে প্রস্তুত হচ্ছিলাম তখন মেঘ না চাইতেই বৃষ্টির মতো দুপুর এলো আমার মুক্তির বার্তা নিয়ে। মুক্তির আনন্দে আমার মনটা নেচে উঠলো। আহ কী আনন্দ! দুঃখ যেমন আকস্মিকভাবে আসে, আনন্দও তেমনি। তখনও দুপুরের খাবার নিয়ে শৈবালেন্দু বা মোস্তফা মীর থানায় আসেনি। এলে ভালো হতো। একটু পরে থানায় এসে ওরা যখন আমাকে পাবে না, তখন?

আনন্দের মধ্যে বিষাদের মতোই একটি প্রশ্ন মনে এলো আমার, আজ তো ছুটির দিন। রবিবার। আজ কোর্ট কোথায়? ডিআইজি সাহেব বললেন, সবকিছু ঠিক আছে। কোর্টের ছুটি থাকে না। আপনি এখুনি কোর্টে চলে যান। সেখানে একজন হাকিম অপেক্ষায় থাকবেন আপনার জন্য। আমাদের তো নিয়ম মেনে চলতে হবে। হাকিম ছাড়া আমরা আপনাকে ছাড়তে পারবো না। তিনি একজন পুলিশ অফিসারের জিপে আমাকে উঠতে বললেন, যিনি আমাকে কোর্টে নিয়ে যাবেন। কী জানি বাবা। আবার ভুল করলাম না তো? এখন তো কাগজে পত্রে আমি রমনা থানা থেকে মুক্ত। এখন আমি কোথায়? এখন আমাকে যদি?-তাহলে? আমি জিপে ওঠার সময় ডিআইজি সাহেব কাঁধে হাত রেখে আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, দুঃখ করবেন না কবি সাহেব, আপনি হলেন লেখক মানুষ। লেখার জন্য নানা রকমের অভিজ্ঞতা দরকার পড়ে। আপনি একসময় এই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পারবেন। দেশের জন্য মাঝে মাঝে এরকম কষ্ট করা ভালো।

আমি বললাম, নিশ্চয়ই, তাতে দেশ ও মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক গাঢ় হয়। দেশের জন্য মানুষ অকাতরে প্রাণ দিচ্ছে। আমি তো সামান্য ক'দিন। এটা কোনো ব্যাপারই না। লেখার কথা বললেন? হ্যাঁ, লিখতে নিশ্চয়ই পারবো। কিন্তু আমি এই অভিজ্ঞতা নিয়ে কিছু লিখবো না। না লেখারই চেষ্টা করবো আমি। আমার লেখার বিষয় আরও অনেক আছে।

২১ বছর পর আজ ঐ কথাগুলো আমার খুব মনে পড়ছে। ডিআইজি ছিলেন একজন সত্যিকারের ভালো মানুষ। আমার প্রতি তিনি ছিলেন খুব সহানুভূতিশীল এবং শ্রদ্ধাশীলও। তাঁকে ঐ কথাটা আমি সেদিন কেন বলেছিলাম? মনে হয় মৃত্যু সম্ভাবনার সঙ্গে যুদ্ধ করে করে কষ্ট পাওয়ার অভিমান থেকেই আমি সেদিন রেগে গিয়ে কথাটা ঐরকম করে বলেছিলাম। যে কথা ভেবে আমি আজও অনুতপ্ত বোধ করি।

দুপুরে আমাকে ভাত দিতে গিয়ে রমনা থানার হাজতে আমাকে না পেয়ে শৈবালেন্দু চোখে অন্ধকার দেখে। সে দ্রুত মহাদেবের বাসায় ফিরে যায় এবং বাসাই ফিরেই হাউ-মাউ করে কাঁদতে শুরু করে। মহাদেবও খুবই দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়ে যায়। আমাকে ছুটির দিনে কোর্টে নিয়ে যাওয়া হয়েছে— রমনা থানা পুলিশের ঐ কথায় তারা কেউই আস্থা স্থাপন করতে পারে না। ওরা ভাবে, কোর্টের নাম করে আমাকে নিশ্চয়ই ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এবং অদ্যই আমার শেষ-রজনী।

মহাদেব, মোস্তফা মীর আর শৈবালেন্দু তিনজন মিলে তখন বিষয়টি তদন্ত করে দেখার জন্য বিকেলের দিকে কোর্টে আসে। যার বন্ধু বা ভাই রক্তচক্ষু-সামরিক বাহিনীর সন্দেহবিদ্ধ — তার নিজের বিপদও কিছু কম ছিল না। ঝুঁকি নিয়েই তারা কোর্টে আসে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা আমাকে আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়। আমার মতো অন্যান্য থানা থেকেও কিছু আসামি সেদিন কোর্টে এসেছিল। কিন্তু ছুটির দিন থাকায় হাকিম সাহেব সহজে কোর্টে আসছিলেন না। সূর্য ডোবার একটু আগে-আগে তিনি কোর্টে আসেন। তখন উকিলের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরি করে, আমাদের মহামান্য হাকিমের সামনে হাজির করা হলে, মাননীয় হাকিম আমার মুক্তিপত্রে সদয় স্বাক্ষর দান করেন।

কাঠগড়া থেকে সমতলে নামামাত্র মহাদেব, মোস্তফা মীর আর শৈবালেন্দু আমার দিকে দৌড়ে ছুটে আসে। আমিও মুক্তির আনন্দে আমার তিন রকমের, তিন বয়সের তিন শুভার্থীর দিকে ধাবিত হই।

কলেরা ইনজেকশন নেয়ার পর কলেরায় আক্রান্ত হওয়ার ভয় থেকে দেহ-মন যেমন মুক্ত হয়—, আমার সেরকমই নিজেকে নির্ভয় বলে মনে হতে থাকে। মনে এইরূপ প্রত্যয় আসে যে, অতঃপর আমাকে আর কেউ দেশদ্রোহী সন্দেহে গ্রেফতার করতে পারবে না। আমি দেশপ্রেমের ইনজেকশন নিয়ে এসেছি। একটা প্রচণ্ড রকমের ভূমিকম্পকে সহ্য করে, বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকার সংগ্রামে আমি জয়ী হয়েছি।

পাঁচ দিনের বন্দিজীবনের ধকল সইতে না পেরে আমার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছিল। আমি

এতো ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম যে, আমি প্রায় কথাই বলতে পারছিলাম না। আমার মাথার চুল কয়েক দিনের মধ্যেই অনেকটা পেকে গিয়েছিল। এমনিতেই আমার স্বাস্থ্য খুব ভালো ছিল না। শীতের সময় আমার সর্দিকাশি হতো। থানা হাজতের ঠান্ডা মেঝে ও স্যাতস্যাতে দেয়ালের একটি ছোট্ট ঘরের মধ্যে অপরিচিতসব হাজতিদের সঙ্গে বন্দি- বিনিদ্র রজনী যাপনের কারণে আমার বুকে কফ জমে যায়। আমি বাসায় ফিরেই শয্যা নিই। পাড়ার যারা আমাকে আর দেখা যাবে না বলে আশংকার মধ্যে ছিলেন, তারা অনেকেই আমাকে দেখতে আসেন। আমার হয়ে মহাদেবই তাদের সঙ্গে কথা বলে। অনেকদিন পর আমি আমার বিশ্বস্ত-বন্ধুর গৃহে নিশ্চিন্তে ঘুমাই।

ঐ দিন আমি আর পিজিতে যাই না। মহাদেব পিজিতে গিয়ে আবুল হাসানকে আমার ফিরে আসার সুসংবাদটি জানায়। আবুল হাসান আমার ভবিষ্যৎ-চিন্তায় খুবই দুর্ভাবনার মধ্যে ছিল। মহাদেবের মুখে আমার মুক্তির খবর পেয়ে হাসান খুব খুশি হয়। মহাদেব রাতে বাসায় ফিরে এলে আমি তার কাছে আবুল হাসানের স্বাস্থ্যের খোঁজ নিই। মহাদেব জানায়, হাসানের অবস্থার খুব একটা উন্নতি হচ্ছে না। ডাক্তাররা ওর ব্যাপারে খুব একটা কার্যকর কিছু করতে পারছেন না।

পরদিন আমি নিজেকে দেখাতে এবং আবুল হাসানকে দেখতে পিজিতে যাই। হাসান পিঠের তলে বালিশ দিয়ে হাসপাতালের শুভ্র- শয্যায় শুয়ে ঘন-ঘন শ্বাস টানছিল। বুক ওঠা নামা করছে। বুঝতে পারছিলাম তার শ্বাস নিতে খুব কষ্ট হচ্ছে। আমাকে দেখেই হাসান বিছানায় উঠে বসতে চায়। আমি ছুটে গিয়ে বিছানায় উবু হয়ে ওর বুকের সঙ্গে বুক মিলাই। আমার মুক্তিতে হাসানকে দায়মুক্ত বলে মনে হয়। সে আমার ঐ ক'দিনের অভিজ্ঞতা জানতে আগ্রহ প্রকাশ করলে, আমি বলি, আমি বেশ ভালোই ছিলাম। পুলিশের হাতে আমি টর্চার হয়েছি কি-না, তা-ও সে জানতে চায়। আমি বলি, না। আমাকে টর্চার না করার জন্য কর্নেল নোয়াজেশ পুলিশের প্রতি যে নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন ঐ নির্দেশটি যে যথাযথভাবে পুলিশ পালন করেছিল, তা শুনে হাসান খুশি হয়।

ফিরে আসার সময় হাসানকে আশায় উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যেই বলি, আমি যখন মুক্তি পেয়ে যমের ঘর থেকে এসেছি, তুমিও ভালো হয়ে যাবে। দেহের বাইরের শত্রুতাকে জয় করে আমি যেমন জীবনযুদ্ধে জয়ী হয়েছি, তুমিও তোমার দেহের ভিতরের শত্রুতাকে জয় করে সুস্থ হয়ে উঠবে। আমি জানতাম, আবুল হাসান ছিল ওর মা এবং ওর বোনদের প্রতি খুবই দুর্বল। বিশেষ করে বুড়ির প্রতি ওর খুবই দুর্বলতা ছিল। পারিবারিক কথা উঠলে হাসান ওর মা এবং বোনদের কথাই বেশি বলতো। বাবা বা ভাইদের কথা সে খুব একটা বলতো না। ওর শয্যাপাশে গ্রাম থেকে আসা বোন বুড়ি এবং মা সর্বদাই উপস্থিত থাকতো। হাসানের কাছ থেকে ওরা আমার সম্পর্কে এবং আমার পরিবারের অনেকের কথাই শুনেছিল। বুড়ি ও হাসানের আম্মা জানতো যে, হাসান অনেকবার আমাদের গ্রামের বাড়িতে গেছে। কিন্তু আমি ওদের বাড়িতে কখনও যাইনি। হাসানও নিজের বাড়িতে খুব একটা যেতো না। সুস্থ থাকার সময়ও হাসান আমার চাইতে কমই গ্রামের বাড়িতে যেতো। বার্লিন থেকে ফিরে আসার পর হাসান একবারও গ্রামের বাড়িতে যায়নি। আমি ওকে গ্রামের বাড়িতে যাবার কথা বললে হাসান বলতো, যাবো ... আরও একটু ভালো হয়ে নিই, পরে যাবো। আমার এখন বড়-ডাক্তারদের কাছাকাছি থাকা দরকার। দীর্ঘদিন হাসান গ্রামের বাড়িতে না যাওয়ার কারণে বুড়ি এবং খালাম্মা আমার কাছে অভিযোগ করলেন। বললেন, এবার হাসান ভালো হয়ে গেলে তুমিও হাসানের সঙ্গে আমাদের বাড়িতে আসবে। আমি বললাম, নিশ্চয়ই যাবো।

বুড়ির মাথায় ও হাসানের পায়ে আদর করে হাত বুলিয়ে দিয়ে আমি হাসপাতাল থেকে চলে আসি। হাসানের পায়ে হাত বুলাতে গিয়ে লক্ষ্য করি, তার পা বেশ ফুলে উঠেছে। তার মানে জল এসেছে হাসানের পায়ে। এটা খুবই খারাপ লক্ষণ। আমি খুব চিন্তিত বোধ করি।

মহাদেব ও আবুল হাসান আমাকে যৌথভাবে যে চিঠি দুটো লিখেছিল— আমি ঐ চিঠি দুটো সঙ্গে করে ঢাকায় নিয়ে এসেছিলাম। আমার প্রিয় চিঠিগুলোকে আমি আমার সঙ্গে

সঙ্গে রাখতাম। আগেই জানিয়েছি, ভারত এবং আমেরিকান কানেকশন ছিল বলে আমার বড় ভাই ও বন্ধু পূরবীর চিঠি দুটো আমি ভয় পেয়ে পুলিশ কন্ট্রোলরুমের বাথরুমে ঢুকে ছিঁড়ে ফেলে টয়লেটে ফ্লাশ করে দিয়েছিলাম। কিন্তু আবুল হাসান ও মহাদেবের চিঠির খামটি আমার পকেটেই ছিল। রমনা হাজতে যখন ছিলাম, যখন আমার ঘুম আসতো না, তখন সময় কাটাবার জন্যই ঐ চিঠি দুটো আমি পড়তাম। বারবার পড়তাম। ভালো লাগতো। হাজতিদের কেউ-কেউ ভাবতো আমি বুঝি আমার কোনো প্রেমিকার চিঠি পড়ছি। আসলে ঐ চিঠি দুটোকে আমি প্রেমপত্ররূপেই জ্ঞান করতাম বন্ধুর উদ্বেগ ও ভালোবাসামাখা ঐ চিঠি দুটো আমাকে জীবনের বিষাদদীর্ণ মুহূর্তে আনন্দ দিতো, বাঁচবার সাহস যোগাতো। উন্নতির পরিবর্তে হাসানের অবস্থা যখন ক্রমশ অবনতির দিতে যাচ্ছিল, তখন আমার কাছে হাসানের চিঠিটির গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়। আমি গভীর রাত্রে আবার হাসানের চিঠিটি খুলে পড়তে বসি। কী বলতে চেয়েছে হাসান চিঠিতে? আমার মতো একজন সামান্য বন্ধুর চিঠি না পাওয়ার জন্য এতো অভিমান হয়েছিল কেন হাসানের? নিজেকে অপরাধী মনে হতে থাকলো আমার।

অন্য অনেককে লিখলেও, হাসান বার্লিন থেকে আমাকে চিঠি লেখেনি। ১৫ আগস্টের পর, ঐরূপ একটি নৃশংসতম রাজনৈতিক হত্যাকান্ডের ঘটনায় আমি যখন মানসিকভাবে একেবারে বিপর্যস্ত, তখন একদিন দুপুরের দিকে আমি আর মোস্তফা মীর হাইকোর্ট মাজার থেকে সিদ্ধি সেবন করে নিউ পল্টনের মেসের দিকে ফিরছিলাম। সুরাইয়ার সঙ্গে একই রিকশায় করে তখন হাসান যাচ্ছিল হাইকোর্টের সামনে দিয়ে। আমি হাসানকে দেখে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে হাত উঠাই। হাসান, স্পষ্টই বুঝতে পারি, সুরাইয়ার নির্দেশে তখন চকিতে অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। রিকশাটি আমাদের পাশ দিয়েই প্রেসক্লাবের দিকে চলে যায়। থামে না। আমি কষ্ট পাই হাসানের ঐরূপ আচরণে। তার দু'একদিন পরেই আমি গ্রামের বাড়িতে ফিরে যাই অনির্দিষ্ট কালের জন্য। মহাদেব ওর বাবার শ্রাদ্ধক্রিয়াদি সম্পন্ন করার জন্য তখন গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিল। মহাদেব নেই, হাসানও আমাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। নিজেকে খুবই নির্বান্ধব বলে মনে হলো। আমার বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখা ঐ অভিমানের কারণেই আমি গ্রাম থেকে ইচ্ছে করেই হাসানকে কোনো চিঠি লিখিনি। আমি চেয়েছিলাম, ওর চিঠি না পাওয়ার কষ্ট আমি যেমন ভোগ করেছি, ওর উপেক্ষা যেমন আমাকে কষ্ট দিয়েছে; আমার উপেক্ষা, আমার চিঠি না পাওয়া কষ্টও তেমনি হাসান অনুভব করুক।

চিঠি না লিখে আমি যতটা আঘাত করতে চেয়েছিলাম হাসানকে, হাসানের চিঠি পড়ে মনে হলো সে তার চেয়ে অনেক বেশি আঘাত পেয়েছে। প্রিয়জনের দেয়া আঘাতকে বড় করে গ্রহণ করার ক্ষমতা, আমার তুলনায় হাসানের যে বেশি ছিল, ওর চিঠি থেকে তাই প্রমাণিত হয়। একটি নরোম-কোমল বন্ধুবৎসল কবিচিত্তকে আহত করার জন্য আমি মনে-মনে কষ্ট পেতে থাকি। মহাদেবের চিঠিটিও ছিল খুবই আন্তরিকতাপূর্ণ। কিন্তু পার্থক্য এই যে, মহাদেবের চিঠিটি নিয়ে আমার মনের মধ্যে কোনো অপরাধবোধ তৈরি হয়নি। হাসানের চিঠিটি আমার মধ্যে একধরনের 'গিল্টি ফিলিং' তৈরি করেছিল।

আমি আবার ভালো করে হাসানের চিঠিটি পড়তে শুরু করি।

আবুল হাসান
মহাদেবের বাসা থেকে

প্রিয় গুণ,

আজ রাত্রে মহাদেবের সঙ্গে আল মাহমুদের এক তুমুল বাক-বিতন্ডার পর, মহাদেবের বাসায় এসে দেখি তোমার একটি অভিমানী চিঠি মহাদেবের কাছে, যা তুমি লিখেছো। চিঠিটা বারবার পড়লুম। অনেকদিন পর তোমার সান্নিধ্য চিঠির মাধ্যমে পেয়ে একদিকে যেমন ভালো লাগলো, অন্যদিকে তেমন আহত হলুম, এই ভেবে যে তুমি আমার ঠিকানা জানা সত্ত্বেও একটা চিঠিও আমাকে লেখোনি। জানি না কী কারণ; তবে চিঠি না পেলেও তোমার

সম্পর্কে অনবরত এর ওর কাছ থেকে খবর নিতে চেষ্টা করেছি— মাঝে মাঝে তোমার অনুপস্থিতির নৈঃসঙ্গের তাড়নায়ই হয়তোবা। এছাড়া এর পেছনে আর কোনো মানবিক কারণ নেই। এক সময় ছিল, যখন তুমি আমাকে হলুদ পোষ্টকার্ডে চিঠি লিখতে— তখন তুমি বাইরে থাকলেও মনে হতো তোমার উপস্থিতি উজ্জ্বলভাবে বর্তমান

আমি মানুষ হিসেবে কতটুকু সৎ এবং শুভবুদ্ধির সেটা বিচার সাপেক্ষ, তবে বন্ধু হিসেবে একসময় তো আমরা পরস্পরের কাছাকাছি এসেছিলাম। আমাদের জীবন যাপন সূত্রগুলি একে একে পরে ছিন্ন- বিচ্ছিন্ন হয়ে চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হলেও সেই প্রবল প্রোচ্ছন্ন দিনগুলির কি কোনো কিছুই আর আমাদের মধ্যে অবশিষ্ট নেই, যা তোমার স্মৃতিকে একবারও নাড়া দিতে পারে? বা পারতো? এবং সেই স্মৃতির সুবাদে একটা চিঠি কি আমিও পেতে পারতুম না? মানি, আমার নিজের কিছু কিছু এককেন্দ্রিক দোষ-ত্রুটি এবং মানবিক দুর্বলতা শেষকালে আমাদের দু'জনকে দু'দিকে সরিয়ে দিয়েছিলো— প্রথমদিকে আমি যা ভালোবাসতাম না সেইগুলি তোমার ভালোবাসার জিনিষ ছিলো— পরে যখোন তুমি সেই মদ, মাগী, গাঁজা, চরস পরিত্যাগ করলে এবং সেই সময় যখোন আমাদের সবচেয়ে নিকটবর্তী হওয়ার সময়, কেন জানি না এক অনির্দিষ্ট অদৃষ্টের তাড়নায় আমরা দু'জন পরস্পরের কাছ থেকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম। বিচ্ছিন্নতার কারণ হয়তোবা আমার দুরারোগ্য ব্যাধির তাড়না।

বার্লিন থেকে আসার পর আমি অন্য মানুষ। ফলে, পুরনো যোগসূত্র সংস্থাপনের চেষ্টা করেছি যতবার, —ততবার দেখেছি আমার শরীর আমার বৈরী। তুমি যা ভালোবাসো, সেইসব আমার শরীর ভালোবাসে না, তবে অসুস্থতার কারণেই। কিন্তু সত্তায় আমাদের যে গভীর সম্পর্কের সূত্র, কবির সঙ্গে কবির সেই সম্পর্ককে তো আমি কোনোদিন ম্লান করিনি।

১৬ আগস্টের পর; তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে– কিন্তু পরে একদিন হঠাৎ জানলাম তুমি আর ঢাকায় নেই। তোমার ঢাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার ব্যাপারটায় দুঃখ পেয়েছিলাম; নৈঃসঙ্গও কম বাজেনি। কিন্তু পরে আবার ভেবেছি, যেভাবে তুমি মাঝে মাঝে বাড়ী যাও, সেভাবেই হয়তো গিয়েছো—, পরে আবার কিছুদিনের মধ্যে ফিরে আসবে। কিন্তু পরে জানতে পারলুম, তুমি গিয়েছো অনেকদিনের জন্য। বাড়ী গিয়ে তুমি বিভিন্নজনের কাছে চিঠি লিখেছো, সেইসব চিঠিতেই এইসব জানতে পেরেছি। আমিও অপেক্ষায় ছিলুম, একটা চিঠি পাবো, কিন্তু সবসময় অপেক্ষা যে ফলপ্রসূ হবে, এটার তো কোনো কথা নেই।

মহাদেবের কাছে তোমার চিঠি বারবার পড়েছি। বারবার পড়বার মতোই। কবির চিঠির মধ্যে যে দুঃখবোধ এবং নৈঃসঙ্গবোধ থাকে, তার সবরকম চীৎকার হঠাৎ আমাকেও একা— সম্পূর্ণ একা করে দিয়ে গেলো কিছুক্ষণের জন্য। এই একাকীত্বের দরকার ছিলো আমারও। আমি অনেকদিন এরকম সুন্দরভাবে একা হতে পারিনি। বার্লিন থেকে ফেরার পর আমি এই একাকীত্বই সান্নিধ্যে খুঁজতে চেষ্টা করেছি। যার জন্য আমি এক রমণীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলাম, এখন সেই শ্রীমতিও আমাকে আর একাকীত্ব দিতে পারেন না।

হতে পারে এই একাকীত্ব কেবল তুমিই আমাকে একবার অনেকদিন ধরে দিয়েছিলে। তুমি কি ভুলেই গেলে সেইসব দিনের কথা— যখন শীতের কুয়াশায় মধ্যরাত্রির বাতাসকে আমরা সাক্ষী রেখে ঢাকা শহরের অলিগলি চষে বেড়িয়েছি। আমরা তখোন কী সুখী ছিলাম না? সেই সুখের কারণেই কি তুমি আবার ফিরে আসতে পারো না? যতোই ভালোবাসার পিছনে ধাবমান আমাদের ছায়া এর ওর সঙ্গে ঘুরুক, তুমিও জানো আর আমিও জানি–একসময় আমরাই আমাদের প্রেমিক ছিলাম। আর একমাত্র পুরুষ এবং আর একজন পুরুষই ভালোবাসার স্মৃতি সংরক্ষণ করতে পারে—, কারণ রমণীরা অতি নশ্বর। কিন্তু সেই নশ্বরতার বেদনাবোধ কেবল কবি-পুরুষরাই একমাত্র গ্রহণ করতে পারে। সেই নশ্বরতার অঙ্গীকারে আমরা আমাদের বেঁধেছিলুম একদিন। এখনও সেই বোধ, সেই ভালোবাসা আমার জীবনের একমাত্র স্মৃতি, জানি না তোমার ক্ষেত্রে তার স্পর্শ আর কতদূর মূল্যবান।

ভালোবাসা নিও। ভালো থেকো। এবং ফিরে এসো।

ইতি। চিরশুভাকাঙ্ক্ষী হাসান।

[সচিত্র সন্ধানী: ১ম বর্ষ, ৩১ সংখ্যা, রবিবার ২৬ নভেম্বর ১৯৭৮]

৯

আমি খুবই শক্ত মনের মানুষ। ছোটবেলায় মাকে হারিয়েছিলাম, কাঁদিনি। বড় ভাই যখন ভারতে চলে যায়, তখনও আমার কান্না আসেনি। আমি সহজে কাঁদি না। একেবারে কাঁদিই না বলা যায়। কিন্তু হাসানের চিঠি পড়ে আমার প্রায় কান্না চলে আসে। আমি মনে-মনে কাঁদি।

হাসানের চিঠিটি আমার হস্তগত হয়েছিল ১৫ অক্টোবর, ১৯৭৫ তারিখে। এর রচনা তারিখ ১২ অক্টোবর রাত। আমাকে অভিমানমুক্ত করার জন্য, চিঠির অন্তিম পঙক্তি এবং ফিরে এসো কথাটাকে কী প্রবল ভালোবাসার আর্তি দিয়েই না কাচের ওয়েটপেপারের ভিতরের রঙিন ফুলের মতো করে সাজিয়েছে হাসান। ওর চিঠি পড়ে মানতেই হলো, আমি হাসানকে যতটা ভালোবেসেছি, হাসান আমাকে তার চেয়ে বেশি ভালোবেসেছে। না হলে এমন চিঠি কখনও বানিয়ে লেখা যায় না।

দিনের পর দিন যেতে থাকে। হাসানের অবস্থার কোনো উন্নতি হয় না। তার অবস্থা ক্রমশ অবনতির দিকেই ধাবিত হতে থাকে। আমরা কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো ক্রমশ নিভে-আসা হাসানের জীবনপ্রদীপের তেলহীন সলতেটিকে উসকে দিয়ে তার মধ্যে আলো ফুটিয়ে তোলার বৃথা চেষ্টায় দিন গুনতে থাকি।

নভেম্বরের ৪ তারিখ হাসান ভর্তি হয়েছিল পিজিতে। ক্রমাগত বাইশ দিন বক্ষব্যাধির সঙ্গে সংগ্রাম করার পর আসে ২৬ নভেম্বর-এর ভোর। শীতের কুয়াশামাখা ভোর হাসানের প্রিয় ছিল। মৃত্যুর জন্য কোন্ সময়টা ভালো— এই নিয়ে একদিন আমার সঙ্গে হাসানের কথা হয়েছিল। আমি বলেছিলাম, মৃত্যুর জন্য কোনো সময়ই ভালো নয়। হাসান বলেছিল, এটা হচ্ছে তোমার গায়ের জোরের কথা। একটা সময় তো বেছে নিতেই হবে। হাসান বলেছিল, আমার ভালো লাগে ভোরের দিকটা। শীতের সময়। ছোটবেলায় গ্রামের বাড়িতে যখন থাকতাম, খুব সকালে উঠতাম ঘুম থেকে, শীতের শেফালি কুড়াবার জন্য। মসজিদে তখন আজান দিতো মোয়াজ্জিন। খুব ভালো লাগতো।

ওর ঐ কথাটাই শেষ পর্যন্ত সত্য হলো। প্রিয় সময়টাতেই শেষ- নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো হাসান। ২৬ নভেম্বরের কুয়াশাঢাকা ভোরে, ঝরা শেফালির মতোই অভিমানী হাসান নশ্বর দেহকে পরিত্যাগ করে ওর অনশ্বর-অদৃশ্য আত্মায় তুলে নিলো অনন্তের পথ।

হাসান যখন জন্মভূমির এই মায়াময় মাটির পৃথক পালংকে শয়ন করবে, তখন তার উদ্বাস্তু-উন্মুল যৌবনসঙ্গীটি যেন ঘটে-যাওয়া রাজনৈতিক নিষ্ঠুরতার ঘটনায় অভিমান করে দূরে, গ্রামের বাড়িতে লুকিয়ে না থেকে ঢাকায় ফিরে এসে তার প্রিয়বন্ধুর অন্তিম পালংক-নির্মাণে অংশ নিতে পারে, তা নিশ্চিত করার জন্যই কি আবুল হাসান এই আবেগমথিত পত্রটি আমাকে লিখেছিলো? ওর অজ্ঞাতসারে? আমার তা মনে হয় না। আমার মনে হয়, হাসান জানতো, এটিই হবে ওর শেষ- চিঠি।

একবার হাসানের মরদেহ তাঁর গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যাবার কথাও ভাবা হয়েছিল, কিন্তু পরে পরিবারের সদস্যরা, তাঁর অনুরাগী ভক্ত ও বন্ধুরা বনানী কবরস্থানেই তাঁকে কবর দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বাংলা একাডেমী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদে নামাজে জানাজা পড়ার পর, আমরা বিকেলের দিকে হাসানের মরদেহটিকে একটি পুষ্পশোভিত ট্রাকে তুলে বনানী কবরস্থানে নিয়ে যাই। তাঁর অন্তিম কাব্যগ্রন্থ 'পৃথক পালংক'-এর প্রকাশক গাজী শাহাবুদ্দিন, আবুল হাসানের কবরের মাটি ক্রয় করার জন্য নগদ তিন হাজার টাকা প্রদান করেন।

আমরা জানতাম, ১৫ আগস্ট, ৩ নভেম্বর এবং ৭ নভেম্বরের শহীদরা বনানীর কবরে শায়িত আছেন। ইচ্ছা থাকলেও এতোদিন ঐ শহীদানদের কবর জিয়ারত করার সুযোগ আমাদের হয়ে ওঠেনি। সুযোগ থাকলেও সাহস হয়নি। আবুল হাসান আমাদের সেই সাহস বাড়িয়ে দিয়ে গেলো। আবুল হাসানের কবরের জন্য একটি ভালো জায়গা খুঁজতে গিয়ে আমি বঙ্গবন্ধুর পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি, রব সেরনিয়াবাত ও শেখ মণির পরিবারের সদস্যদের কবরের সামনে থমকে দাঁড়াই। ১৫ আগস্টের নিহতদের কবরের পরই একই

সারিতে ৩ নভেম্বরে জেলে নিহত ৩ জাতীয় নেতা : সৈয়দ নজরুল ইসলাম, এম, মনসুর আলী এবং তাজউদ্দিনের কবর। তিন নেতার কবর পেরুতেই চোখে পড়লো নভেম্বরে 'সিপাহী বিপ্লবে' নিহত খালেদ মোশাররফের ব্যর্থ অভ্যুত্থানের বিশ্বস্ত সহযোগী (রংপুর বিগ্রেডের কমান্ডার) কর্নেল নাজমুল হুদার কবর। কর্নেল খন্দকার নাজমুল হুদার কবরের পরে আর কারও কবর হয়নি। পাশের জায়গাটা ছিল খালি। কেন খালি ছিল, কে জানে? হয়তো ভয়ে। আওয়ামী-বাকশালীদের সমর্থক ও ভারতের চর হিসেবে কলংকিত করে যারা খালেদ মোশাররফ ও তাঁর দুই সহযোগীকে হত্যা করেছিলো, পরে তারাই রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করায়, মনে হয় ৩ নভেম্বরের ব্যর্থ-অভ্যুত্থানের অন্যতম নায়কের পাশে কেউ তার প্রিয়জনকে কবর দিতে সাহস পাচ্ছিল না, পাছে মৃতের জীবিতরা রাষ্ট্রক্ষমতা দখলকারীদের কুনজরে পড়ে যায়। ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানের নায়করা সত্যি-সত্যিই ভারতের চর ছিলো— ঐরূপ বিশ্বাস থেকেও এমনটি হতে পারে। কিন্তু আমার ঐরূপ ভয় ছিল না। আমি কখনও বিশ্বাস করিনি, খালেদ মোশাররফ-হুদা-হায়দাররা ভারতের চর। বরং ভারত জুজুর ভয় তখন যারা বেশি দেখিয়েছিল, তাদের নিয়েই আমার সন্দেহ। খালেদ-হুদা-হায়দাররা ছিলেন সত্যিকারের বীর ও দেশপ্রেমিক। খালেদ মোশাররফের কবরটি ছিল বনানী কবরস্থান সংলগ্ন আর্মি গ্রেভিয়ার্ডের ভিতরে। ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থাকারী বীর কর্নেল হুদার পাশের জায়গাটা খালি পেয়ে আমার খুব ভালো লাগলো। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী হিসেবে কর্নেল হুদা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একজন বিশ্বস্ত ভক্ত ছিলেন। সিদ্ধান্ত নিলাম, কর্নেল হুদার কবরের পাশেই আবুল হাসানেরও কবর হবে।

সবাই আমার প্রস্তাব মেনে নিলো। তখন বনানীর মাটি খুঁড়ে আমরা হাসানের জন্য একটি গভীর কবর খনন করলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই ১৫ আগস্ট, ৩ নভেম্বর ও ৭ নভেম্বরে বীরদের পাশে নির্মিত হলো ২৬ নভেম্বরের প্রয়াত অভিমানী এক কবির কবর। জীবদ্দশায়, চঞ্চল-জীবন যাদের দূরে-দূরে সরিয়ে রেখেছিলো, নিশ্চল-মৃত্যু ঐ মহৎ প্রাণগুলোকে একই মালার ফুলের মতো করে পাশাপাশি গেঁথে দিয়ে গেলো।

হাসানের মরদেহকে কবরে শুইয়ে দিয়ে, আমরা যখন নগরীর দিকে ফিরছি, তখন আমার বক্ষচাপা-ক্রন্দন, উদ্গত দীর্ঘশ্বাসের মতো মুক্ত হলো একটি ছোট্ট-পঙক্তিতে: ভালোবেসে যাকে ছুঁই সেই যায় দীর্ঘ পরবাসে...।

হাসানের জন্য এলিজি লেখার সময় এটি, ঐ এলিজির অন্তিমচরণে পরিণত হয়। ২৬ নভেম্বরের ভোরে আবুল হাসানের মৃত্যুর পাশাপাশি আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। হাসানের মৃত্যুসংবাদ শুনে আমি যখন পিজি হাসপাতালের গেইটে পৌঁছাই— তখন হঠাৎ একদল পুলিশ ছুটে এসে পিজি হাসপাতালটিকে ঘিরে ফেলে। পুলিশ কর্ডন করা অবস্থায় একটি বড় কালো মার্সিডিজ গাড়ি একইসঙ্গে খুব দ্রুত পিজি হাসপাতালের ভিতরে প্রবেশ করে। আমি হাসপাতালের ভিতরে প্রবেশ করতে গিয়ে দেখতে পাই, পুলিশরা একজন রাষ্ট্রদূতকে ধরাধরি করে হাসপাতালের রিসেপশনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। একজন পুলিশকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারি, উনি হচ্ছেন ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রীসমর সেন। তখন তাঁর দেহ ছিল রক্তাক্ত। তাঁর গায়ে শার্ট ছিল না। শুধু গেঞ্জি ছিল। তিনি বাম হাতে ডান কাঁধের দিকে একটি ক্ষতস্থানকে চেপে ধরে খুবই ক্রুদ্ধ-ভঙ্গিতে চারপাশে তাকাচ্ছিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে স্ট্রেচার নিয়ে নার্স ও ডাক্তাররা সমর সেনকে বাঁচানোর জন্য ছুটে আসে। আমি দ্রুত ঐ ঘটনাটিকে পাশ কাটিয়ে উপরে উঠে যাই। সমর সেনের কী হয়েছে–তা আর তখন জানা হয়নি।

পরে জানতে পারি, ৬ জন আত্মঘাতী তরুণের একটি দল সকালের দিকে ভারতীয় হাইকমিশনার শ্রীসমর সেনকে অপহরণ করার জন্য ধানমন্ডির ২ নম্বর সড়কে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসে হামলা চালিয়েছিল। অল্পের জন্য ঐ হামলাটি ব্যর্থ হয়। শ্রীসেনের দেহরক্ষী এবং দুতাবাস-প্রহরারত পুলিশের গুলিতে ঘটনাস্থলেই অপহরণপ্রয়াসীদের মধ্যে চারজন নিহত হয়। দু'জন আহত অবস্থায় পুলিশের হাতে ধরে পড়ে। এরা সবাই জাসদের

কর্মী বলে জানা যায়।

এই ঘটনার দু'দিন আগে, ২৩ নভেম্বর রাষ্ট্রদ্রোহী তৎপরতায় লিপ্ত থাকার অভিযোগে জাসদ নেতা রব-জলিলসহ ১৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। সরকারী পত্রিকা দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত সংবাদের শিরোনামে শুধুই আসম রব ও মেজর জলিলের কথা থাকলেও, ভিতরে ১৭ নম্বর আসামী হিসেবে যে নামটি ছিল, ওটিই ছিল ঐ কথিত রাষ্ট্রদ্রোহী মামলার আসল টার্গেট। তাঁর নাম কর্নেল তাহের।

ঐ মৃত্যুদণ্ডযোগ্য রাষ্ট্রদ্রোহী মামলাটি যে কর্নেল তাহেরকে ফাঁসিতে লটকিয়ে দেবার জন্যই করা হয়েছে— তা বুঝতে পেরেই জাসদ-এর ছয় জন জঙ্গী সদস্য একটি আত্মঘাতী স্কোয়াড গঠন করে ভারতীয় হাইকমিশনার শ্রীসমর সেনকে অপহরণের মাধ্যমে জিম্মি করার চেষ্টা করেছিলো। এভাবেই তারা ঐ মামলাটি প্রত্যাহারে জিয়ার সরকারকে ভারতের চাপের মুখে ফেলতে চেয়েছিলো। কিন্তু জাসদের জন্য বিধি ছিল বাম। তাই, পরিকল্পনাটি অল্পের জন্য ব্যর্থ হয়ে যায়। তাহেরকে বাঁচাতে গিয়ে তাহেরের আপন এক ছোট ভাইসহ চার-চারটি তাজা- তরুণ প্রাণ অকালে ঝরে পড়ে।

খালেদ মোশাররফের ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক আছে—এই অভিযোগটি প্রচার করার ব্যাপারে কর্নেল তাহের ও তাঁর দলের খুবই তৎপর ভূমিকা ছিলো। যার পরিণতিতে খালেদ মোশাররফসহ তিন-তিনজন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে জীবন দিতে হয়। নিয়তির নির্মম পরিহাসই বলতে হবে, ১৯ দিনের ব্যবধানে, সেই ভারতকে সম্পর্কিত করেই জিয়ার হাত থেকে বাঁচার পথ সন্ধান করতে হলো তাহের ও তাঁর দলকে। ঐ অপহরণ-প্রচেষ্টাটি সফল হলে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নিতো, তা আমাদের কল্পনার বিষয় হিসেবেই থেকে গেলো।

শ্রীসমর সেনকে জিম্মি করার প্রচেষ্টাটি ব্যর্থ হওয়ার ফলে শেষ পর্যন্ত জেনারেল জিয়াই লাভবান হন। জঙ্গী জাসদের মোকাবিলায় তিনি ভারতের পরোক্ষ সমর্থন লাভ করেন। তাই, অল্পদিনের ব্যবধানে, সংক্ষিপ্ত সামরিক আদালতে দ্রুত বিচারের মাধ্যমে নিষ্ঠুর জিয়া ৭ নভেম্বরের 'সিপাহী বিপ্লবের' অন্যতম প্রধান রূপকার, মুক্তিযুদ্ধে এক-পা হারানো অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল আবু তাহেরকে প্রত্যাশিত অনুকম্পা প্রদর্শনের পরিবর্তে, অবলীলায় ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেন।

এভাবেই ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের রক্তঝরা নভেম্বর মাসটির অবসান হয়।

***

ঘটনাপঞ্জী

৭ই মার্চ ১৯৭১

শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষন

২৫শে মার্চ

শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতার

অপারেশন সার্চলাইট

৩রা ডিসেম্বর

কোলকাতায় ইন্দিরা গান্ধীর সভা

পাকিস্তানের বোমা বর্ষণ

তৃতীয় ভারত–পাক যুদ্ধ

১৬ই ডিসেম্বর

পাকিস্তানের আত্মসমর্পণ

বাংলাদেশ স্বাধীন

১০ই জানুয়ারী ১৯৭২

মুজিবের প্রত্যাবর্তন

১২ই জানুয়ারী

সরকার গঠন

ভারতীয় সেনার প্রত্যাবর্তন

১৪ই অগস্ট ১৯৭৫

মুজিবের হত্যা

৩রা নভেম্বর

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি চার জাতীয় নেতা নিহত হয়েছেন।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম

তাজউদ্দিন আহমদ

এম. মনসুর আলী এবং

এ এইচ এম কামরুজ্জামান